সংগ্রামী হাতিয়ার

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র

সাম্রাজ্যবাদী নৃশংসতার শতবর্ষ (১৯১৯ — ২০১৮)

আগস্ট '১৮ ■ ৪৭তম বর্ষ ■ চতুর্থ সংখ্যা ■ মূল্য দু'টাকা

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির উদ্যোগে

প্রথম রাজ্য মহিলা কনভেনশন

রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের প্রতিনিধিত্বকারী একমাত্র সর্বভারতীয় সংগঠন সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশন, একবিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়া থেকেই বিভিন্ন প্রদেশে প্রশাসনের অভ্যন্তরে মহিলা কর্মচারীদের সংগঠিত করা, সমস্যা সমাধানে প্রশাসনের উপর চাপ সৃষ্টি করা, কর্মচারী আন্দোলনের মূলস্রোতে মহিলাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও সংগঠন কাঠামোর বিভিন্ন স্তরে তাঁদের নেতৃত্বে উন্নীত করার লক্ষ্যে জাতীয়স্তরে মহিলা কনভেনশন করে থাকে। কিন্তু আমাদের রাজ্যে রাজ্যস্তরে এই প্রথম মহিলা কনভেনশনের আয়োজন করে রাজ্য

উদ্বোধক ঃ কনীনিকা ঘোষ

কো-অর্ডিনেশন কমিটি গত ৮ ও ৯ সেপ্টেম্বর '১৮। যা রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। গত ৮ সেপ্টেম্বর সকাল ১০.৩০ মিনিটে কর্মচারীভবন থেকে মহিলা প্রতিনিধিদের সুসজ্জিত মিছিল শুরু হয় এবং মধ্য কলকাতার মৌলালি এলাকা পরিক্রমণ করে কর্মচারী ভবনের কনভেনশন স্থলে ফিরে আসে। মিছিলের পর কর্মচারী ভবনের অরবিন্দ সভাকক্ষে মনিকা পাল মঞ্চে

জবাবী ভাষণ ঃ বিজয় শঙ্কর সিংহ

প্রতিবেদন পেশ ঃ সুতপা হাজরা

শুরু হয় দু'দিনের মহিলা কনভেনশন। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক শাখা প্রথমে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করে। অতঃপর গীতা দে, দেবলা মুখার্জী, পৌষালি সরকার ও মীনা রায়কে নিয়ে সভাপতিমণ্ডলী গঠিত হয়। শাশ্বতী মজুমদার, সুচেতা সাহা ও অর্চনা সাহাকে নিয়ে গঠিত হয় অনুলিখন কমিটি এবং ক্রেডেনশিয়াল কমিটি গঠিত হয় সংগঠনের সহ-সম্পাদকদ্বয় মানস দাস ও অনুপ বিশ্বাসকে নিয়ে। সভার প্রথমেই সভানেত্রী গীতা দে শোকপ্রস্তাব পাঠ করেন ও নীরবতা পালন করা হয়।

বিশেষ প্রস্তাব উত্থাপন ঃ বিশ্বজিৎ গুপ্তচৌধুরী

কনভেনশন-এর উদ্বোধক কনীনিকা ঘোষকে (সম্পাদক, সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি) পুষ্পস্তবক দিয়ে সংবর্ধনা জানান বিজয় শংকর সিংহ, সাধারণ সম্পাদক রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। কনীনিকা ঘোষ খুব প্রাঞ্জল ভাষায় বর্তমান

ষষ্ঠ পাতায় চতুর্থ কলমে

৩০ আগস্ট ২০১৮

কলকাতায় কেন্দ্রীয় মহামিছিল

কেন্দ্রীয় মহামিছিলে অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাথে উপস্থিত বাম পরিষদীয় নেতা সুজন চক্রবর্তী

বকেয়া মহার্ঘভাতা অবিলম্বে প্রদান, ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশ দ্রুত প্রকাশ ও কার্যকরী করাসহ পাঁচদফা দাবীতে বিগত ৩০ আগস্ট ২০১৮ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির আহ্বানে এক কেন্দ্রীয় মহিমিছিল ধর্মতলার লেনিন মূর্তির পাদদেশ থেকে শিয়ালদহ বিগবাজার পর্যন্ত সংগঠিত হয়। একই সঙ্গে প্রতিটি জেলার জেলা সদরেও এই কর্মসূচী প্রতিপালিত হয়। বিগত ২৮-২৯ জুলাই ২০১৮ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক সংস্থা রাজ্য কাউন্সিল এর সভা থেকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, যে ৫ দফা দাবিতে ব্যাজ পরিধান কর্মসূচী এবং দপ্তরে দপ্তরে ১:৩০-২:৩০ মিনিট পর্যন্ত বিক্ষোভ কর্মসূচী ২৬-২৮ জুন ২০১৮-তে প্রতিপালিত হয়েছে, সেই ৫ দফা দাবির সমর্থনেই পথে নেমে আন্দোলন কর্মসূচীতে শামিল হতে হবে, কলকাতার রাজপথে মহামিছিল সংগঠিত করতে হবে, মিছিল সংগঠিত করতে হবে জেলায় জেলায়, সরকারের কাছে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ক্ষোভের বার্তাকে তুলে ধরতে হবে। রাজ্য কাউন্সিলের এই আহ্বান কলকাতার ৭টি অঞ্চল এবং পার্শ্ববর্তী ৪টি জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া ও হুগলীর কর্মচারীদের কাছে সংগঠনের কর্মী-নেতৃত্বরা পৌঁছে দেওয়া মাত্রই কর্মচারীদের মধ্যে দারুণ উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। তাই ৩০ আগস্ট এক বৃহৎ কর্মচারী সমাজ সমস্ত প্রতিবন্ধকতা-প্রতিকূলতাকে

ষষ্ঠ পাতার প্রথম কলমে

কেরালার বানভাসি মানুষের পাশে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি

সর্বভারতীয় ফেডারেশনের চেয়ারম্যান সুভাষ লাম্বার হাতে ১০ লক্ষ টাকার চেক তুলে দিচ্ছেন বিজয় শঙ্কর সিংহ এবং বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী

ভয়াবহ বন্যায় বিধ্বস্ত কেরালাবাসীর পুনর্বাসন এবং ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাসমূহের দ্রুত ও উপযুক্ত পুনর্গঠনের যে কর্মসূচী ঐ রাজ্যের বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট সরকার গ্রহণ করেছে, তার পাশে বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে, বহু ট্রেড ইউনিয়ন ও গণসংগঠন। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকেও, সংগঠনের অতীত ঐতিহ্য অনুসরণ করেই, কেরালার বানভাসি মানুষের প্রতি সাহায্যের হাত প্রসারিত করার জন্য রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের কাছে আবেদন জানানো হয়। ২০ টাকার কুপনের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহের সিদ্ধান্ত সংগঠন গ্রহণ করে। নবান্ন থেকে শুরু করে রাজ্যের প্রত্যন্ত ব্লকের গ্রাম পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত, প্রতিটি দপ্তরে, বিভাগে কর্মরত কর্মচারীদের কাছে একাধিক কুপন সংগ্রহের আবেদন জানানো হয়। কর্মরত কর্মচারীদের পাশাপাশি অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের কাছেও, রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতির পক্ষ থেকে আবেদন পৌঁছে দেওয়া হয়। স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া মিলতে থাকে কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের কাছ থেকে। অর্থসংগ্রহের কাজ এখনও চলছে। প্রাথমিক পর্বে সংগৃহীত ১০ লক্ষ টাকা ইতোমধ্যেই কেরালার বানভাসি মানুষের জন্য পাঠানো হয়েছে। গত ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮, দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের সম্পাদকমণ্ডলীর সভায়, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিংহ কেরালার সাহায্যার্থে ১০ লক্ষ টাকার একটি চেক তুলে দেন সর্বভারতীয় সংগঠনের চেয়ারম্যান সুভাষ লাম্বার হাতে। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের যুগ্ম-সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বন্যার কারণেই কেরালার প্রতিনিধিরা ঐ সভায় উপস্থিত থাকতে পারেননি। সর্বভারতীয় সংগঠনের পক্ষ থেকে ঐ টাকা পৌঁছে দেওয়া হবে কেরালার সংগঠনের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে। □

সম্পাদকীয়

'দ্য ইকনমিস্ট', মার্কস এবং শ্রমজীবী জনগণ

লন্ডন থেকে প্রকাশিত 'দ্য ইকনমিস্ট' সাপ্তাহিক পত্রিকা পুঁজিবাদ তথা পুঁজিবাদী উদারনৈতিক ব্যবস্থার প্রথম সারির মুখপত্র। এবং এই পরিচয় তারা গোপন করে না, আমাদের দেশের, রাজ্যের বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রগুলির মতন 'নিরপেক্ষতা'-র ভানও করে না। এ হেন 'দ্য ইকনমিস্ট' পত্রিকা এবার ১৭৫ বছর পূর্ণ করল। হ্যাঁ, ঠিকই দেখছেন, ছাপার ভুল নয়, দীর্ঘ ১৭৫ বছর ধরে এই সাপ্তাহিকী পুঁজিবাদী উদারনৈতিক ব্যবস্থার পক্ষে সওয়াল করে চলেছে। 'দ্য ইকনমিস্ট' সম্পর্কে এতগুলি কথা বলার কারণই হল, সম্প্রতি প্রকাশিত (১৫-২১ সেপ্টেম্বর ২০১৮) একটি সংখ্যায়, ১৭৫তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে কয়েকটি বিশেষ নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। যেগুলির সাধারণ শিরোনাম হল 'A manifesto for renewing liberalism'। অর্থাৎ উদারবাদের পুনর্নবীকরণের লক্ষ্যে রচিত ইশতেহার। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, আপন অভিভাবককে প্রসাধন মাখানোর জন্য 'দ্য ইকনমিস্ট' এত ব্যস্ত হয়ে পড়ল কেন?

এর উত্তরটা 'দ্য ইকনমিস্ট' নিজেই দিয়েছে। বেশকিছু তথ্য সহযোগে মোদ্দা যে কথাটা তারা বলতে চেয়েছে তা হল, আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ, ফরাসী বিপ্লব এবং শিল্প ও প্রযুক্তি বিপ্লবের হাত ধরে যে উদারবাদ যাত্রা শুরু করেছিল, উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী জুড়ে তার গতি ছিল অপ্রতিরোধ্য। ওদের ভাষায়, ফ্যাসিবাদ ও বলশেভিকবাদের ধাক্কা সামলেও উদারবাদ এগোতে পেরেছিল এবং বিভিন্ন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা তৈরী করতে পেরেছিল। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীতে এসে, বিশেষত ২০০৮-এর মহামন্দার পরে সেই গ্রহণযোগ্যতা হ্রাস পাচ্ছে। একটা সমীক্ষা করে তারা দেখেছে, ইউরোপ ও আমেরিকার বহু মানুষ এই ব্যবস্থার ওপর ভরসা হারাচ্ছেন। তাঁরা বিশ্বাস করতে চাইছেন না যে, এই ব্যবস্থা তাঁদের ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে মঙ্গলদায়ক হবে। দ্য ইকনমিস্টের মতে উদারবাদ ক্রমশ তার বৈধতা হারানোর ফলে, জাত, ধর্ম, লিঙ্গভিত্তিক বিভাজন ও সংঘর্ষ বৃদ্ধি পাচ্ছে। 'দ্য ইকনমিস্ট' তার মত করে এই সমস্যা থেকে বেড়িয়ে আসার জন্য উদারবাদের পুনর্নবীকরণের প্রস্তাব করেছে। কিন্তু সেটা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। এমনকি উনবিংশ-বিংশ শতাব্দী জুড়ে উদারবাদের অব্যাহত জয়যাত্রার যে কথা ঐ পত্রিকা বলেছে, তাও যে ভ্রান্ত বিশেষত, বিংশ শতাব্দীতে তো বটেই, তথ্য-প্রমাণ সহযোগে যে কথা প্রতিষ্ঠিত করতেও খুব বেশী সময় আমাদের লাগবে না। কিন্তু সেই বিতর্কে আমরা ঢুকব না। কারণ আমাদের কাছে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয় তা হল, 'দ্য ইকনমিস্ট'-ও বলতে বাধ্য হয়েছে যে উদারবাদ ও মানুষের বিচ্ছিন্নতা বাড়ছে। এবং যার সুযোগ বহু জায়গায় গ্রহণ করছে চরম দক্ষিণপন্থী শক্তি। দ্য ইকনমিস্ট-এর বিলাপ হল সমাজের উপরতলার ১ শতাংশ মানুষ নিজেদের একটা আরামদায়ক বেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ রেখেছে। নীচের তলার মানুষের কথা ভাবেনি। কিন্তু মুল কথাটা দ্য ইকনমিস্ট বলেনি বা বলতে চায়নি। তাহল, ঐ বিশেষ সুবিধাভোগী ১ শতাংশ সৃষ্টি হল কিভাবে? নয়া উদারবাদী অর্থনীতি (দ্য ইকনমিস্ট অবশ্য নয়া উদারবাদ বা উদারবাদ এরকম কোন বিভাজন করেনি। তাদের কাছে সবটাই উদারবাদ) বা 'গ্লোবালাইজেশন' (এই শব্দটা ওরা ব্যবহার করেছে) যে বিপুল ধন বৈষম্যের কারণ তা আমরা জানি।

ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকটের শিকার হত দরিদ্র মানুষ বহু দেশেই চরম দক্ষিণপন্থী শক্তিকে সমর্থন করেছে বা তাদের খপ্পরে গিয়ে পড়েছে। অথচ অর্থনীতির প্রশ্নে কোন বিকল্প পথ এদের জানা নেই। উৎপাদন ও পরিষেবা ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের বর্ধিত বিনিয়োগও এদের ইস্যু নয়। এরা সংকটের দায় কর্পোরেট পুঁজি বা লগ্নী পুঁজির ওপর চাপায় না। এরা সংকটের দায় চাপায় দেশের অভ্যন্তরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর অথবা অভিবাসীদের ওপর। ভ্রান্ত শত্রু চিহ্নিত করে উগ্র জাত্যাভিমান সৃষ্টি করার এই প্রক্রিয়া সাধারণ মানুষের মধ্যে বহুধা বিভাজন সৃষ্টি করে। পরিচিত স্বত্তার সংকট থেকে মাথা চাড়া দেয় পরিচিত স্বত্তার রাজনীতি।

সাধারণ অবস্থায় (অর্থাৎ যখন সংকট নেই) লগ্নীপুঁজি কিন্তু এই পরিস্থিতিকে সমর্থন করে না। কারণ সামাজিক অস্থিরতা তাদের বিনিয়োগ ও মুনাফার সম্ভাবনাকে ব্যাহত করে। কিন্তু সংকটকালীন পরিস্থিতিতে সামাজিক অস্থিরতা লগ্নীপুঁজির কাছে আশীর্বাদ। কারণ সংকট থেকে বেরিয়ে আসার জন্য রাষ্ট্রকে ব্যবহার করে যে কোন রাস্তা অনুসরণ করলেও (তা যতই জনস্বার্থ বিরোধী বা অমানবিক হোক), অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়। ধর্ম, ভাষা, জাত ইত্যাদি নিয়ে নিজেদের মধ্যে লড়তে থাকা মানুষ প্রয়োজনীয় ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে না।

এই প্রেক্ষিতেই আমাদের দেশে উগ্র দক্ষিণপন্থী শক্তির রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন হওয়া, কর্পোরেট লবির বিপুল সমর্থন, দেশজোড়া ধর্মীয় মেরুকরণের প্রক্রিয়া প্রভৃতি বিষয়গুলিকে দেখা দরকার। আমাদের দেশে উগ্র দক্ষিণপন্থী হিন্দুত্ববাদী শক্তি আর এস এস-র নেতৃত্বে পরিচালিত বিজেপি কেন্দ্রে সরকার গঠন করার পর যে অর্থনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ করে, তার সাথে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ক্ষমতাসীন চরম দক্ষিণপন্থী দলগুলির অর্থনৈতিক কর্মসূচীর কোন পার্থক্য নেই। থাকার কথাও নয়। কারণ এরা সকলেই নিজ নিজ দেশের কর্পোরেট পুঁজি ও আন্তর্জাতিক লগ্নী পুঁজির সেবা দাস। বিভিন্ন ধরনের পরিচিত স্বত্তার উপাদানগুলিকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা তৈরী করা হয়, পুঁজির শোষণকে নিরঙ্কুশ করার জন্য। কিন্তু এই পরিকল্পনা একেবারে ১০০ শতাংশ কার্যকরী হয়, তা কিন্তু নয়। সব মানুষই পরিচিত স্বত্তার ভাবাবেগে ভেসে যান, তা কিন্তু নয়। যাঁরা যান না, তাঁদের অর্জিত অথবা সাংবিধানিক অধিকারগুলির ওপর প্রত্যক্ষ আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়। এক্ষেত্রেও পুঁজির স্বার্থে রাষ্ট্রকে ব্যবহার করে। প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে 'দ্য ইকনমিস্ট'-কে আসরে নামাতে হল কেন? কেনই বা একটা ইশতেহার তৈরী করতে হল? কেনই বা হঠাৎ করে এই পত্রিকা তার অভিভাবকের ত্রুটি-দুর্বলতা খুঁজে বের করতে সচেষ্ট হল? এই সমস্ত প্রশ্নের একটাই উত্তর। আসলে সংকটটা খুবই দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে। আই এম এফ, বিশ্বব্যাঙ্ক, ডব্লু টি ও, বেইল-আউট, বেইল-ইন, অস্টারিটি ইত্যাদি কোন টোটকাতেই কাজ হচ্ছে না। আর সংকট দীর্ঘস্থায়ী হলে গোটা ব্যবস্থাটারই বৈধতা হারানোর আশঙ্কা থাকে। এমনকি পুঁজি নিজের হাতে দুধ-কলা খাওয়ায় যে বিভেদকামী শক্তিগুলিকে তাদের মধ্যে যেকোন একটা দ্রুত বেড়ে উঠে 'ফ্রাঙ্কেস্টাইন' হয়ে সৃষ্টিকর্তার দিকেই ধেয়ে যেতে পারে। যেমনটা হয়েছিল হিটলার ও মুসোলিনি নামক ফ্রাঙ্কোস্টাইন-এর ক্ষেত্রে। কারণ গত শতাব্দীর বিশের দশকের মন্দাও দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। অবশ্য বর্তমান সংকট আরও প্রলম্বিত।

অতীতের ঐ মহাসংকটের সময় মেইনার্ড কেইনস্‌কে আসরে নামতে হয়েছিল উদারবাদের রক্ষাকর্তা হিসেবে। পুঁজিবাদকে জনকল্যাণে ব্রতী হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন কেইনস। যদিও রুজভেল্ট, চার্চিল প্রমুখ প্রথমাবস্থায় কেইনস-এর পরামর্শে কর্ণপাত করেননি। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নির্ণায়ক শক্তি হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা, সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের বিপুল জনপ্রিয়তা ইত্যাদি কারণে যুদ্ধ উত্তর পর্বে তাঁরা বাধ্য হয়েছিলেন কেইনস প্রদর্শিত পথে চলতে। এবারের সংকট থেকে পুঁজিবাদ তথা উদারবাদকে রক্ষা করার জন্য কেইন্সীয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে চাইছে 'দ্য ইকনমিস্ট'। একথা তারা পরোক্ষে উল্লেখও করেছে। তাদের বক্তব্যের নির্যাস হল 'এন্ড অফ হিস্ট্রি' বা 'ক্ল্যাশ অফ সিভিলাইজেশন'-এর তত্ত্ব কোনটিই উদারবাদকে সুরক্ষিত রাখতে পারেনি। অতএব 'কেইন্সং স্মরণং গচ্ছামি'। প্রেসক্রিপশনও প্রায় একই— কর ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস, জনকল্যাণে বরাদ্দ বৃদ্ধি, সঠিক অভিবাসন নীতি ইত্যাদি। কেইন্সের চোখের সামনে ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন, 'দ্য ইকনমিস্টের' চোখের সামনে সোভিয়েত ইউনিয়ন নেই। কিন্তু রয়েছে চীন। চীন 'উদারবাদ' অনুসরণ না করেও কিভাবে তার আর্থিক সমৃদ্ধি ঘটাচ্ছে, তা বড় দুশ্চিন্তার কারণ দ্য ইকনমিস্টের। আরও একটা দুশ্চিন্তার কারণ রয়েছে 'দ্য ইকনমিস্টের'। তা হল, ডোনাল্ড ট্রাম্প। ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে এই পত্রিকার সরাসরি অভিযোগ হল, তিনি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে শুধুমাত্র উপেক্ষাই করছেন না, দুর্বল করারও চেষ্টা করছেন। পুঁজিবাদী উদারবাদের মূল কেন্দ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। আর সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতায় আসীন হয়ে ট্রাম্প উদারবাদকে দুর্বল করার চেষ্টা করছেন। এতো সর্ষের মধ্যেই ভুত। দ্য ইকনমিস্টের দুশ্চিন্তাতো হবেই।

সারা বিশ্বেই শ্রমজীবীদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ধর্ম-ভাষা-জাত-লিঙ্গ ইত্যাদি আইডেনটিটি ভিত্তিক হট্টগোলের শিকার, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহই নেই। কিন্তু সবাই নন। বহু মানুষ ঘোর বঞ্চনার মধ্যেও শ্রেণী আন্দোলনের বৈঠাটাকে শক্ত করে ধরে এগোতে চাইছেন। তাঁরা, যাঁরা নিজেদের শ্রমজীবী পরিচয়টাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন, তাঁরা 'দ্য ইকনমিস্টের' ভাষ্যের সাথে আংশিক সহমত। ওরা রোগটা ঠিকই ধরেছে। কিন্তু রোগের কারণ যা বলেছে, তার সাথে শ্রেণীদৃষ্টিঙ্গী সম্পন্ন শ্রমজীবীদের আন্দোলন একমত নয়।

দ্য ইকনমিস্টের মতে উপরের এক শতাংশের আত্মতুষ্টি, নির্লিপ্ততা, নিজেদের পুনর্নবীকরণ করার অনীহা ইত্যাদি সংকটের কারণ। কিন্তু প্রকৃত কারণটা ঠিক বিপরীত। উপরের এক শতাংশের সীমাহীন মুনাফার উদগ্র বাসনাই সমস্ত সংকটের কারণ। মুনাফালোভী উপরের এক শতাংশই সমস্ত ধরনের বিভাজনের শক্তিগুলিকে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ মদত দিচ্ছে। মার্কস সাহেব তো কবেই বলে গেছিলেন, ৩০০ শতাংশ মুনাফার জন্য পুঁজি যেকোন ধরনের অপরাধ করতে পরে। তাই দ্য ইকনমিস্টের ইশতেহার আর মার্কস রচিত (এঙ্গেলস সহ) ইশতেহারের মধ্যে, শ্রমজীবীরা বেছে নিচ্ছেন মার্কস-এর ইশতেহার। দ্য ইকনমিস্ট বয়সে (১৭৫ বছর) মার্কসের (২০০ বছর) থেকে কিছুটা ছোট। কিন্তু চিন্তায় মার্কসের থেকে শতযোজন দুরে। □

২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৮

ভারত-মার্কিন ২+২ চুক্তি

ভারতকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পরিচালিত সামরিক জোটের অংশীদার করার পরিকল্পনা ক্ষমতায় বসেই শুরু করে মোদি সরকার। ঘন ঘন মার্কিন সফর, মার্কিন সেনাবাহিনীর সাথে ভারতীয় সেনাবাহিনীর যৌথ সামরিক মহড়া, জোট নিরপেক্ষ বিদেশ নীতিকে বিসর্জন দেওয়া, ইস্রায়েলের সাথে সখ্যতা বৃদ্ধি এবং ওদেশ থেকে অস্ত্র কেনা, মার্কিন চাপে রাশিয়া থেকে অস্ত্র কেনার পরিমাণ হ্রাস করা প্রভৃতি সিদ্ধান্তের মধ্যে দিয়ে মোদি সরকারের মার্কিন প্রেমের প্রকাশ ঘটছিল। এটি চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করল, গত ৬ সেপ্টেম্বর ভারত-মার্কিন ২+২ বৈঠকে উভয় দেশের প্রতিরক্ষা ও বিদেশ মন্ত্রীদের মধ্যে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে ভারতকে স্ট্র্যাটেজিক ছোট শরিকে পরিণত করার মার্কিন অভিসন্ধি অনেকটাই ফলপ্রসূ হয়েছে। এই গাঁট বন্ধনের মূল লক্ষ্য উভয় দেশের মধ্যে সামরিক ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত সমন্বয় গড়ে তোলা।

অতীতেও উভয় দেশের বিদেশমন্ত্রী ও বাণিজ্য মন্ত্রীদের মধ্যে ২+২ বৈঠক হয়েছে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বাসনা ছিল, এই ধরনের বৈঠকে বাণিজ্যমন্ত্রীর পরিবর্তে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীরা উপস্থিত থাকুন। স্বভাবতই কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম। বাণিজ্যমন্ত্রীকে সরিয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী নির্মলা সীতারামন এই বৈঠকে হাজির হয়েছিলেন। চীনের আর্থিক সমৃদ্ধি ও সামরিক শক্তি বৃদ্ধিতে উদ্বিগ্ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেদিন থেকে এশিয় প্রশান্ত মহাসাগরিয় অঞ্চলটিকে তাদের সামরিক পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার দেয়, সেদিন থেকেই ভারতকে কাছে টানার কৌশলও শুরু হয়। ২০১৫ সালে মার্কিন রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামা ভারত সফরকালে এশিয় প্রশান্ত মহাসগরীয় এবং ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের জন্য যৌথ প্রয়াসের চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। নিজ দেশের প্রতিরক্ষা স্বার্থকে মার্কিন প্রতিরক্ষা স্বার্থে নিয়ন্ত্রনাধীন করার পদক্ষেপে খুশি হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২০১৬ সালে ভারতকে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা অংশীদার হিসেবে ঘোষণা করে। এ যাবৎ কাল যে তকমা জুটেছিল কেবলমাত্র ন্যাটো ভুক্ত দেশগুলির এবং এশিয়ায় মার্কিন সহযোগী দুই দেশ জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার।

মোদি সরকার ২০১৫ সালে ইউ পি এ-১ আমলে স্বাক্ষরিত 'ডিফেন্স ফ্রেম ওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট' কে আরও ১০ বছরের জন্য পুনর্নবীকরণ করে। ২০১৬ সালে তারা স্বাক্ষর করে 'লজিস্টিক এক্সচেঞ্জ মেমোর‍্যান্ডাম অফ এগ্রিমেন্ট' (LEMOA) এই চুক্তির ফলে মার্কিন নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী তাদের প্রয়োজনে ভারতীয় নৌ-বন্দর ও বিমান বন্দরগুলিকে ব্যবহার করতে পারবে। এমনকি তৃতীয় কোনো দেশকে আক্রমণের সময় ভারতীয় পরিকাঠামোকে ব্যবহার করা যাবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ সামরিক সহযোগীদের সাথেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই ধরনের চুক্তি করে।

মোদি সরকার মার্কিন প্রেমে এতটাই উদ্‌বেল যে তারা এখানেই থেমে থাকতে রাজি নয়। আরও নত জানু হতে চায়। মার্কিন প্রতিরক্ষা স্বার্থের কাছে নিজ দেশের প্রতিরক্ষা স্বার্থকে বলি দিতে তারা বদ্ধ পরিকর। তাই সাম্প্রতিক বৈঠকে স্বাক্ষরিত হয়েছে --- 'কমিউনিকেশন, কমপ্যাটিবিলিটি, অ্যান্ড সিকিউরিটি এগ্রিমেন্ট'। এরপরের ধাপ হবে বেসিক এক্সচেঞ্জ অ্যান্ড কো-অপারেশন এগ্রিমেন্ট।

২+২ বৈঠকে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী ভারত সরকারকে তার প্রতিরক্ষার প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের অধিকাংশই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে কিনতে হবে। স্বাধীনতার পর থেকে এ যাবৎকাল ভারতে প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের বৃহত্তম সরবরাহকারী দেশ ছিল রাশিয়া। কিন্তু এই চুক্তির ফলে রাশিয়া থেকে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম আমদানির পরিমাণ হ্রাস পাবে এমনকি পেতে শুরুও করেছে। প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী গত ৩ বছরে বিভিন্ন মার্কিন প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম প্রস্তুতকারী সংস্থা ভারতের সাথে ২৮৮ বিলিয়ন ডলারের চুক্তি করেছে। একই সময় রাশিয়ার সাথে চুক্তি হয়েছে ৮৩ বিলিয়ান ডলারের। COMCASA অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট শুধুমাত্র সর্বাধিক প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহকারী দেশই হবে না, এই সমস্ত অস্ত্রের ব্যবহারের ওপরেও নজরদারি রাখবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ফ্রান্সের সাথে স্বাক্ষরিত 'রাফালে' চুক্তিতে মোট বিমান ক্রয়ের সংখ্যা ১২৬ থেকে কমিয়ে ৩৬ করা হয়েছে COMCASA র চাপে। এমন কি মোদি সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও অস্ট্রেলিয়ার সাথে চতুর্ভুজীয় জোট গড়ে তুলতেও সম্মত হয়েছে। ২+২ চুক্তি শুধুমাত্র প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকছে না। ভারতের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে ইরান থেকে তেল আমদানি ক্রমান্বয় হ্রাস করে শূন্যে নামিয়ে আনার জন্য। ডোনাল্ড ট্রাম্প ইতোমধ্যে হুমকি দিয়েছেন যেসমস্ত দেশ ইরান থেকে তেল আমদানি আগামী নভেম্বর মাসের মধ্যে হ্রাস করবে না তাদের ওপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা জারি করা হবে।

মার্কিন সংসদে ইতোমধ্যে একটি আইন পাশ হয়েছে। যার নাম 'কাউন্টারিং আমেরিকাস অ্যাডভারসারিস থ্রু স্যাংশন এ্যাক্ট'। এই আইন অনুযায়ী যেসমস্ত দেশ বর্ধিত সংখ্যায় রাশিয়া থেকে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম কিনবে তাঁরা মার্কিন অবরোধের মুখে পড়বে। এর ফলে মোদি সরকার পড়েছে মহা ফাঁপড়ে। কারণ ইতোমধ্যেই তাঁরা রাশিয়া থেকে পাঁচটি অত্যাধুনিক মিশাইল কেনার চুক্তি করেছে। তাই ২+২ বৈঠকে অনুনয় বিনয় করা হয়েছে ঐ মিশাইল কেনার প্রয়োজনীয় অনুমোদনের জন্য। কিন্তু মার্কিন প্রতিনিধিরা কোনো প্রতিশ্রুতি দেয়নি।

এককথায় এই বৈঠক থেকে ভারতকে শূন্য হাতে ফিরতে হয়েছে। এমনকি ভারত থেকে রপ্তানিকৃত ইস্পাত ও অ্যালুমিনিয়ামের ওপর শুল্ক হ্রাস করতেও তারা রাজি হয়নি। পরম জাতীয়তাবাদী মোদি সরকার মার্কিন সুতোর টানে নাচছে। □

টাকার দাম কমছে

আন্তর্জাতিক মুদ্রা ডলারের সাপেক্ষে হু হু করে নামছে টাকার দাম। ২০১৪ সালে মোদী সরকার যখন ক্ষমতায় আসে, তখন ১ ডলারের দাম ছিল ৫৯ টাকা। এবছর ৭ সেপ্টেম্বর তা কমে দাঁড়ায় ৭১.৮৮ টাকা। টাকার এই অবমূল্যায়নের ফলে বাড়ছে আমদানি খরচ, কমছে বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয়ের পরিমাণ এবং বৈদেশিক ঋণের ওপর অতিরিক্ত সুদ গুণতে হচ্ছে। অথচ এই বিষয়ে কেন্দ্রের মোদী সরকারের কোনো হেলদোল নেই। সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টারা সম্ভবত একথা ভাবছেন, যে টাকার দাম কমতে কমতে 'বাজার'-এর নিয়মেই একসময় থেমে যাবে। অর্থনীতিতে যাকে বলা হয় ''ভারসাম্য'' স্তর। 'ভারসাম্য'-র স্তর হল এমন পর্যায়ে যেখানে রপ্তানি বৃদ্ধি এবং আমদানি হ্রাস পেয়ে বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস পায়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে বাজার অর্থনীতির এই তত্ত্ব অনেকগুলি কারণে আত্মঘাতী। টাকার দামকে নামতে নামতে ভারসাম্য স্তর পর্যন্ত পৌঁছতে দেওয়ার পরিণামে বিপুল বোঝা চাপে সাধারণ মানুষের ওপর। দ্বিতীয়ত, টাকার দাম কমার ফলে ঘটে মুদ্রাস্ফীতি। মুদ্রাস্ফীতির ফলে দেশীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘটে, ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে এই পণ্যের চাহিদা হ্রাস পায়। তৃতীয়ত, বিভিন্ন ভারতীয় কোম্পানি বিশ্ব আর্থিক বাজার থেকে বিপুল পরিমাণ ঋণ করে। টাকার দাম কমার ফলে, সম্পদের তুলনায় তাদের ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। যা পরবর্তী পর্বে তাদের দেউলিয়াপনার দিকে ঠেলে দেয়। এই ধরনের ঘটনা যে ঘটতে পারে, এমন আশঙ্কা থেকে ফাটকা কারবারীরা নিজেদের গুটিয়ে নিতে শুরু করে, ফলে টাকার দাম আরও কমতে থাকে।

এই ধরনের পরিস্থিতিতে হস্তক্ষেপ না করে, চুপ করে বসে থাকার যে রাস্তা মোদী সরকার গ্রহণ করেছে, তার ফলে ভারতীয় অর্থনীতি ক্রমান্বয়ে এমন সংকটের মধ্যে পড়তে পারে, যেখান থেকে বেরোনোর জন্য আই এম এফ-র শর্ত কন্টকিত ঋণ গ্রহণ করা ছাড়া কোন উপায় থাকবে না। ঠিক যেমনটা হয়েছিল গ্রীসের ক্ষেত্রে। □

প্রায় প্রতিদিনই বাড়ছে পেট্রোপণ্যের দাম

মোদী সরকারের ঢাক-ঢোল পেটানো 'আচ্ছে দিন' আর 'সুশাসন'-এর স্লোগান আসলে কি— তা প্রায় প্রতিদিনই হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন দেশের 'আম জনতা'। কারণ লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে পেট্রল, ডিজেল, রান্নার গ্যাস প্রভৃতি পেট্রোপণ্যের। ফলে পাল্লা দিয়ে দাম বাড়ছে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষেরও।

বিভিন্ন ধরনের পেট্রোপণ্যের যে চাহিদা রয়েছে আমাদের দেশে, তার ৮০ শতাংশই বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়। স্বভাবতই আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামের ওঠা-নামার সাথে সাথে দেশের অভ্যন্তরেও পেট্রোপণ্যের দাম ওঠা-নামার কথা। সাধারণ যুক্তি তাই বলে। কিন্তু সাধারণ যুক্তি যা বলে, নয়া উদারবাদী অর্থনীতির পৃষ্ঠপোষক ও কর্পোরেট পুঁজির তল্পিবাহক মোদী সরকার তা করে না। অথচ পেট্রল, ডিজেল প্রভৃতি পেট্রোপণ্যের মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি বি-নিয়ন্ত্রিত করার সময় কিন্তু এমনই আশার বাণী শোনানো হয়েছিল। বলা হয়েছিল, এখন থেকে সরকার আর পেট্রোপণ্যের দাম নির্ধারণ করবে না। বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত তেল কোম্পানিগুলি এই দায়িত্ব প্রতিপালন করবে, এবং তারা তা করবে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দামের সাথে সঙ্গতি রেখেই। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম কমলে, দেশের বাজারেও তেলের দাম কমার কথা। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা হল ঠিক উল্টো। ২০১৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে ব্যারেল প্রতি অপরিশোধিত তেলের দাম ১০০ ডলার থেকে নামতে নামতে দাঁড়ায় ৩০ ডলারে। অথচ অপরিশোধিত তেলের ব্যাপক মূল্য হ্রাসের কোনো প্রতিফলন দেশের বাজারে পেট্রোপণ্যের দামে পড়েনি। কারণ তেল কোম্পানিগুলির ঘাড়ে বন্দুক রেখে, সাধারণ মানুষের ওপর বোঝা চাপিয়ে মোদী সরকার রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিপুল পরিমাণ শুল্ক চাপাতে থাকে পেট্রল, ডিজেল ও রান্নার গ্যাসের ওপর। এই পথে সাধারণ মানুষের পকেট কেটে ২০১৪-১৫ সালে তারা রাজস্ব আদায় করে ১ লক্ষ কোটি টাকা। ২০১৭-১৮ সালে এই আদায় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ লক্ষ ৩০ হাজার কোটি টাকায়। অর্থাৎ বিশ্ব বাজারে তেলের দাম বিপুল পরিমাণে কমলেও এতটুকু স্বস্তি পাননি এদেশের মানুষ। কেন্দ্রের চাপানো অন্তঃশুল্কের ওপর আরও চাপে রাজ্যগুলির 'ভ্যাট'। এই 'ভ্যাট' রাজ্যগুলির আয় বৃদ্ধির একটি উৎস। সব মিলিয়ে দেখা যায় দেশের বাজারে যে দামে পেট্রল, ডিজেল বিক্রী হয় তার ৫০ শতাংশের বেশী হল কেন্দ্রের শুল্ক আর রাজ্যের ভ্যাট। নভেম্বর, ২০১৪ থেকে জানুয়ারি ২০১৬ পর্যন্ত বিশ্ব বাজারে তেলের দাম টানা নেমেছে। অথচ এই সময়েই সাধারণ মানুষের কথা বিন্দুমাত্র না ভেবে পেট্রল ও ডিজেলের ওপর উৎপাদন শুল্ক বেড়েছে ন'বার। পেট্রলের ক্ষেত্রে প্রতি লিটারে মোট বেড়েছে ১১.৭৭ টাকা, ডিজেল ১৩.৪৭ টাকা। বাদ যায়নি রান্নার গ্যাসও। ২০১৪ সালের মে মাসে নরেন্দ্র মোদী যখন মেহনতি জনতার স্বঘোষিত মসীহা সেজে ক্ষমতায় বসেন, তখন সিলিন্ডার পিছু রান্নার গ্যাসের দাম ছিল ৪১৪ টাকা। আজ চার বছর পর সেই দাম বেড়ে দাঁড়িয়েছে সিলিন্ডার পিছু ৮১৭.৫০ টাকা। এই চার বছরে রান্নার গ্যাসের দাম বেড়েছে ২২ বার।

আমাদের দেশের সংবিধানে বিক্রয়করকে রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয় করা হয়েছে। অর্থাৎ বিভিন্ন পণ্যের ওপর ধার্য বিক্রয়কর রাজ্য সরকারগুলির আয়ের গুরুত্বপূর্ণ উৎস। এর মধ্যে রয়েছে পেট্রোপণ্যও। ফলে পেট্রোপণ্যের ওপর বিক্রয় কর বসিয়ে রাজ্যগুলিও আয় করে। একেকটি রাজ্যের বিক্রয় করের হার একেকরকম। যেমন পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে পেট্রলের ওপর বিক্রয় কর ২৫ শতাংশ, ডিজেলের ওপর ১৫ শতাংশ। নির্ধারিত বিক্রয় করের ২০ শতাংশ সারচার্জ এবং লিটার পিছু ১ টাকা করে সেস আদায় করা হয়। ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে এই খাতে রাজ্য সরকারের আয় হয়েছে ৭৫০০ কোটি টাকা। অতীতে বামফ্রন্ট সরকার জনগণের বোঝা কিছুটা লাঘব করার জন্য একাধিকবার পেট্রল, ডিজেলের ওপর বিক্রয়করের হার হ্রাস করে। রাজ্য সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হবে জেনেও, জনগণের স্বার্থে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার গত সাত বছরে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কখনও এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি। গত ১০ সেপ্টেম্বর দেশব্যাপী বামপন্থীদের ডাকা হরতালের প্রভাব (সরকারের প্রত্যক্ষ বিরোধিতা সত্ত্বেও) এ রাজ্যেও প্রত্যক্ষ করে লিটার পিছু ১ টাকা করে বিক্রয় কর কমানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। □

নোট বন্দীর পরিণতি

সম্প্রতি প্রকাশিত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ২০১৭-১৮ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন নোটবন্দীকে কেন্দ্র করে মোদী সরকারের প্রচারের ফানুস ফুটো করে দিয়েছে। এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাতিল ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোটের ৯৯.৩ শতাংশই ব্যাঙ্কের কাছে ফিরে এসেছে। ২০১৬ সালের ডিসেম্বর মাসেও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বলেছিল ১৫.৪২ লক্ষ কোটি টাকা মূল্যের বাতিল নোটের মধ্যে ১২.৪৪ লক্ষ কোটি টাকা মূল্যের নোটই ব্যাঙ্কের কাছে ফেরৎ এসেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রদত্ত তৎকালীন ঐ পরিসংখ্যানকে (যা চূড়ান্ত ছিল না) মোদী সরকার মানতে চায়নি। কারণ তাদের বক্তব্য ছিল, আনুমানিক ৫ লক্ষ কোটি মূল্যের কালো টাকা দেশের অর্থনীতিতে ঘুরপাক খাচ্ছে। তাদের দাবির সাথে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রকাশিত তৎকালীন পরিসংখ্যানের সঙ্গতি ছিল না বলেই, মোদী সরকার ঐ পরিসংখ্যানটিকে অতিরিক্ত বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল।

ব্যাঙ্কে ফেরৎ আসা বাতিল নোটের মূল্য নির্ধারণ করতে আর বি আই প্রায় দু'বছর সময় নিল। ২০১৭-১৮-এর বার্ষিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ফেরৎ আসা নোটের মোট মূল্য ১৫.৩১ লক্ষ কোটি টাকা। ফেরৎ না আসা ০.৭ শতাংশ বাতিল নোটের মোট মূল্য মাত্র ০.১১ লক্ষ কোটি টাকা। অর্থাৎ যে পরিমাণ কালো টাকা বাজারে খাটছে বলে মোদী সরকার দাবি করেছিল, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রতিবেদন বলছে, তার ভগ্নাংশ মাত্রই চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০১৬ সালের নভেম্বর মাসে চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মতামতকে উপেক্ষা করে 'নোট বন্দী'-র সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের মোদী সরকার গ্রহণ করেছিল। রঘুরাম রাজন সহ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বেশ কয়েকজন প্রাক্তন গভর্নর এই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা থেকে সরকারকে বিরত থাকতে বলেছিলেন। এমনকি আর বি আই-এর বিভিন্ন নথিতেও আলোচনা করা হয়েছে, আমাদের দেশের ধনী সম্প্রদায় তাদের সম্পদের ৯০ শতাংশই রাখে বিভিন্ন সামগ্রীর আকারে। তাই অতীতে একাধিকবার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কও 'নোট বন্দী'র সরকারী প্রস্তাবের বিরোধীতা করেছিল। কিন্তু বর্তমানে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কও ক্রমে তার স্বাধীন-সত্ত্বাকে হারিয়ে ফেলে, সরকারী সিদ্ধান্তে সিলমোহর লাগানোর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে দেশের অর্থনীতিতে, বিশেষ অসংগঠিত ক্ষেত্রে নোটবন্দীর বিপর্যয়কর প্রভাব নিয়ে ইতোমধ্যেই বহু আলোচনা হয়েছে। এবং সমস্ত আলোচনাই হয়েছে মূলত উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও আয়ের নিরিখে। যা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বিপর্যয়ের প্রকৃত গভীরতা পরিমাপ করতে হলে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো এবং বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর গৃহস্থলী সম্পর্কিত বৈশিষ্ট্য সমূহের নিবিড় পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন। দুঃখের হলেও সত্যি, আমাদের দেশে তেমন কোন পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার পদ্ধতি অনুসৃত হয় না।

লক্ষ্যণীয় হল, কালো টাকা উদ্ধারের দাবি যখন নস্যাৎ হয়ে গেছে, তখন নোটবন্দীর নতুন উদ্দেশ্য হাজির করা হয়েছে জনগণের সামনে। যেমন সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা, বে-আইনী অস্ত্রের কারবার বন্ধ, কর ফাঁকি রোধ এবং ডিজিট্যাল অর্থনীতি চালু করা। কিন্তু এগুলির কোনটির জন্যই নোটবন্দী করে গরীব মানুষের সর্বনাশ করার প্রয়োজন ছিল না। □

রাজ্য মহিলা কনভেনশনে গৃহীত

প্রতিবাদকে স্তব্ধ করার স্বৈরতান্ত্রিক চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রস্তাব

গত ২৮ আগস্ট ২০১৮, মহারাষ্ট্র রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত পুণে পুলিশ দেশের পাঁচটি রাজ্যের বিভিন্ন শহর থেকে পাঁচজন মানবাধিকার ও নাগরিক স্বাধীনতা কর্মী এবং বামপন্থী বুদ্ধিজীবীকে গ্রেপ্তার করে। ঐদিন যাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়, তাঁরা হলেন, সুধা ভরদ্বাজ, গৌতম নভলাখা, ভারভারা রাও, ভারনন গঞ্জালভেস এবং অরুণ ফেরেইরা। এছাড়াও গোয়ায় শিক্ষাবিদ এবং দলিত বুদ্ধিজীবী আনন্দ তেলতুম্বদে, রাঁচিতে যাজক স্ট্যান স্বামী সহ বেশ কয়েকজনের বাড়ীতে তল্লাসি চালানো হয়। গ্রেপ্তারী অথবা তল্লাসি চালানোর সময়েই তাঁদের ল্যাপটপ, হার্ড ডিস্ক, মোবাইল ফোন সহ জরুরী কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়। কেন সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত কয়েকজন বুদ্ধিজীবী ও মানবাধিকার কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হল বা তাঁদের বাড়ীতে তল্লাসি চালানো হল? এই প্রশ্নের উত্তরে পুণে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, এঁরা সকলেই নাকি 'এলগার পরিষদ'-এর সভ্য এবং ভীমা-কোরেগাঁও সঙ্ঘর্ষের ঘটনায় যুক্ত ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এ বছর ১ জানুয়ারি ভীমা-কোরেগাঁও-এর দলিত সমাবেশে উগ্র দক্ষিণপন্থী হিন্দুত্ব বাহিনী আক্রমণ সংগঠিত করে।

মহারাষ্ট্র পুলিশ, গত জুলাই মাসে প্রায় একই কায়দায় আরও পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছিল, যাঁদের মধ্যে ছিলেন দলিত আন্দোলনের নেতা সুধীর ধাওয়ালে, আইনজীবী সুরেন্দ্র গ্যাডলিং এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিকা সোমা সেন। জুলাই-এর গ্রেপ্তারীতেও অভিযোগ ছিল একই— এবং তাহল ভীমা-কোরেগাঁও সঙ্ঘর্ষে ইন্ধন যোগানো। পাশাপাশি একটি জাল চিঠি প্রকাশ করে, এমন হাস্যকর অভিযোগও করা হয়েছিল যে তাঁরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে হত্যার চক্রান্ত করেছিলেন। বিস্ময়কর হল, প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার চক্রান্তের মতন একটি গুরুতর অভিযোগের তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হল শুধুমাত্র পুণে পুলিশকে। জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা, যাদের এই ধরনের গুরতর অভিযোগের তদন্ত করার দক্ষতা রয়েছে, তাদের এমনকি সিবিআই এবং 'র' (R&AW)-এর মতন সংস্থাকেও দায়িত্ব দেওয়া হল না।

মহারাষ্ট্র পুলিশ সাজানো অভিযোগের ভিত্তিতে বামপন্থী, বুদ্ধিজীবী, দলিত আন্দোলনের প্রতিনিধি ও মানবাধিকার কর্মীদের গ্রেপ্তার করতে যতটা মরীয়া, ঠিক ততটাই উদাসীন দলিতদের ওপর আক্রমণের ঘটনায় প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের দুই প্রতিনিধি মিলিন্দ একবোটে এবং শম্ভাজী ভিড়েকে গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে। সুপ্রীম কোর্টের চাপে একবোটেকে গ্রেপ্তার করা হলেও, একমাসের মধ্যেই সে জামিন পেয়ে যায়। আর শম্ভাজীর ক্ষেত্রে সেটুকুও করা হয়নি।

জুলাই ও আগস্ট মাসের ঘটনায় যাঁদের গ্রেপ্তার করা হল, তাঁদের বিরুদ্ধে 'বেআইনী কার্যকলাপে (প্রতিরোধ) আইন' (ইউ এ পি এ) প্রয়োগ করার জন্য 'মাওবাদী' সংযোগের তক্‌মা লাগানো হচ্ছে। অথচ নরেন্দ্র দাভোলকর, গোবিন্দ পানসারে, এম এম কালবুর্গী ও গৌরীলঙ্কেশের হত্যার ঘটনায় হিন্দুত্ববাদী সনাতন সংস্থার যোগসূত্র প্রকাশ্যে আসা সত্ত্বেও, এই বিষয়ে মহরাষ্ট্র সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার নীরব। সম্প্রতি গৌরী লঙ্কেশ হত্যার তদন্তে কর্ণাটক পুলিশ সনাতন সংস্থার তিনজন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। এদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেছে, মহারাষ্ট্রের পাঁচটি শহরে বিস্ফোরণ ঘটানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল সনাতন সংস্থা। এই সন্ত্রাসবাদী পরিকল্পনা ফাঁস হওয়ার পরেও, মহারাষ্ট্র সরকার সনাতন সংস্থা ও তার সহযোগী হিন্দু জনজাগৃতি সমিতির বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়নি। কিন্তু প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিজীবী, মানবাধিকার কর্মীদের 'ইউ এ পি এ'-তে গ্রেপ্তার করার জন্য 'মাওবাদী' তকমা লাগাতে ও বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ নেই।

আসলে এই সমস্তকিছুর মধ্য দিয়ে একটাই বার্তা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে, এবং তা হল দলিত, আদিবাসী, সংখ্যালঘুর বা সমাজের যেকোন শোষিত অংশের পক্ষে কথা বললেই রাষ্ট্রীয় নির্যাতনের শিকার হতে হবে। বুদ্ধিজীবী ও মানবাধিকার কর্মীদের হত্যা ও গ্রেপ্তারীর ঘটনা কোন বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়। গণতন্ত্রকে সঙ্কুচিত করে, ক্রমান্বয়ে স্বৈরতান্ত্রিক আক্রমণ নামিয়ে আনা হল আর এস এস-বিজেপির হিন্দুত্ববাদী কর্মসূচীর অঙ্গ। কেন্দ্রে ও অধিকাংশ রাজ্যে ক্ষমতায় থাকার সুযোগ নিয়ে যাকে কার্যকরী করা হচ্ছে। এর সূচনা হয়েছিল ২০১৪ সালে লোকসভা নির্বাচনের পর থেকেই। আক্রমণটা শুরু হয়েছিল সংখ্যালঘুদের ওপর। মহম্মদ আখলাক, রফিক, জুনেইদ, ইব্রাহিম, পেহলু খানদের হত্যার মধ্য দিয়ে। ক্রমে তা প্রসারিত হয় দলিত, আদিবাসী ও অবশেষে বুদ্ধিজীবীদের ওপর। প্রতিবাদকে ধ্বংস করা, প্রতিবাদী কণ্ঠকে হত্যা করা এবং সমাজের পিছিয়ে পরা ও সংখ্যালঘু অংশের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করার এই কৌশল আরএসএস-বিজেপি গ্রহণ করেছে হিটলার ও মুসোলিনির পদাঙ্ক অনুসরণ করেই। স্বভাবতই সুপ্রীম কোর্টও বলতে বাধ্য হয়েছে, ''বিরুদ্ধ মতই গণতন্ত্রের সেফটি ভালভ্, এই সেফটি ভালভ্ অকেজো করলে প্রেসার কুকারের মতই ফেটে পড়বে গণতন্ত্র।''

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কেন্দ্রে ও বিভিন্ন রাজ্যে আরএসএসের নির্দেশে বিজেপি সরকার যে পথ অনুসরণ করছে, সেই গণতন্ত্রকে হত্যা করার পথ অনুসরণ করছে এ রাজ্যের তৃণমূল সরকারও। অপ্রিয় প্রশ্ন করলে 'মাওবাদী' তকমা লাগিয়ে দেওয়ার কাজ হয় এরাজ্যেও। শিলাদিত্য চৌধুরী, তানিয়া ভরদ্বাজ বা অম্বিকেশ মহাপাত্র যার উদাহরণ। গণতন্ত্রকে প্রহসনে পরিণত করার কাজেও রাজ্যের তৃণমূল সরকার বিজেপি পরিচালিত সরকারগুলির ন্যায় সিদ্ধহস্ত। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত পঞ্চায়েত নির্বাচনে যেমন গণতন্ত্রের হত্যালীলা প্রত্যক্ষ করলেন এ রাজ্যের মানুষ। গণতন্ত্র হীনতা, স্বৈরতান্ত্রিক কায়দায় প্রশাসন পরিচালনার প্রত্যক্ষ শিকার আমরা রাজ্য সরকারী কর্মচারীরাও। তাই দেশ ও রাজ্যের গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রামে অপরাপর অংশের মানুষের সাথে আমাদেরও সর্বশক্তি নিয়ে শামিল হতে হবে। এই প্রস্তাবটি গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে রাজ্য কনভেনশন থেকে দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে অগ্রসর হওয়ার শপথ আমাদের গ্রহণ করতে হবে। □

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতিসমূহের রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি

প্রেস বিবৃতি

গতকাল, ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৮, উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুরের দাঁড়িভিট উচ্চবিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে আন্দোলনরত ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর বিনা প্ররোচনায় গুলি চালায় রাজ্যের শাসকদলের দাস পুলিশ বাহিনী। পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছে রাজেশ সরকার নামে এক ছাত্র। আহত হয় বেশ কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি এই ন্যক্কারজনক ঘটনার বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জোরালো ভাষায় উত্থাপন করছে।রাজ্যে গণতন্ত্রীহীনতার প্রতিবাদে শ্রমিক কর্মচারীরা আগামীদিনে তীব্রতর লড়াই আন্দোলন গড়ে তুলবে।

স্বাক্ষর ঃ বিজয় শঙ্কর সিংহ
সাধারণ সম্পাদক

রাফালে যুদ্ধ বিমান কেলেঙ্কারি

'না খায়ুঙ্গা, না খানে দুঙ্গা'— এটা ছিল নরেন্দ্র মোদীর অনেকগুলি নির্বাচনী জুমলার মধ্যে একটি। এর অর্থ হল মোদী মন্ত্রিসভার কোন সদস্য ঘুষ খাবেন না, কাউকে ঘুষ খেতেও দেবেন না। কিন্তু সরকার গঠনের চারবছর পর আজ যদি নরেন্দ্র মোদী একই কথা বলেন, তাহলে মানুষতো বটেই ঘোড়াও হাসবে। কারণ ললিত মোদী, নীরব মোদী, মেহুল চোক্সী, বিজয় মালিয়ার পর এবার রাফালে কেলেংকারি। ক্রিকেট থেকে ব্যাঙ্ক হয়ে এবারে একেবারে দেশের প্রতিরক্ষাকেও দুর্নীতির চক্রব্যূহের মধ্যে টেনে এনেছে মোদী সরকার।

২০১২ সালে ইউপিএ-২ সরকারের আমলে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম কেনার নিয়ম অনুযায়ী বিমান বাহিনীর চাহিদা ও ডিফেন্স অ্যাকুইজিশন কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত মেনে, ফরাসী সরকারের সাথে চুক্তি হয়েছিল। ঐ দেশের প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উৎপাদনকারী সংস্থা 'দাসাউ'-এর কাছ থেকে ১২৬টি যুদ্ধ বিমান কেনার। ঐ চুক্তিতেই বলা হয়েছিল, ১২৬টি বিমানের মধ্যে মাত্র ৫টি বিমান দাসাউ নির্মাণ করবে। বাকিগুলি নির্মিত হবে ভারতেই। প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে 'দাসাউ'-এর সহযোগিতায় রাষ্ট্রায়ত্ত নবরত্ন সংস্থা 'হিন্দুস্থান অ্যারোনেটিকস লিমিটেড (হ্যাল) এই কাজ করবে। বিমানপিছু দাম পড়বে ৫২৬ কোটি টাকা।

কিন্তু ২০১৪ সালে কেন্দ্রে সরকার গঠন করে বিজেপি-র নেতৃত্বে এনডিএ। ২০১৫ সালে ফ্রান্স সফরে যান নরেন্দ্র মোদী। সেখানে গিয়ে তিনি উপরোক্ত চুক্তিটি বাতিল করে, 'দাসাউ এভিয়েশন'-এর সাথে একটি নতুন চুক্তি করেন। যেখানে পূর্বতন চুক্তির অনেকগুলি বিষয় পরিবর্তন করা হয়। যেমন, নতুন চুক্তিতে বলা হয় 'দাসাউ' ১২৬টির পরিবর্তে ৩৬টি বিমান সরবরাহ করবে। দ্বিতীয়ত, সমস্ত বিমানগুলির নির্মাণ হবে ফ্রান্সেই। প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে এদেশে নির্মাণ হবে না। তৃতীয়ত, এবং যা সর্বাধিক বিস্ময়কর তা হল, 'দাসাউ'-এর ভারতীয় অংশীদার হিসেবে নবরত্ন সংস্থা 'হ্যাল'-কে সরিয়ে অনিল আম্বানির সংস্থাকে যুক্ত করা হল। প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম নির্মাণের প্রশ্নে 'হ্যাল'-এর দক্ষতা আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃত। অথচ অনিল আম্বানীর নব নির্মিত সংস্থাটির এই ধরনের কাজে কোন পূর্ব-অভিজ্ঞতাই নেই এমনকি সংস্থাটি তৈরীও হয়েছে। নরেন্দ্র মোদী চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করায় মাত্র কয়েকদিন আগে। কেন এই পরিবর্তন? এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন ফরাসী রাষ্ট্রপতি ফ্রাঁসোয়া ওলেন্দে নিজেই। ফ্রান্সের সরকারী ওয়েবসাইট 'মিডিয়া পার্টনার'-এ এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, এই পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত একান্তভাবেই ভারত সরকারের। ফ্রান্সের সরকার অথবা 'দাসাউ'-এর এক্ষেত্রে করণীয় কিছু ছিল না। চতুর্থত নতুন চুক্তি অনুযায়ী প্রতিটি বিমানের মূল্যও বৃদ্ধি পাবে।

ঋণভারে জর্জরিত অনিল আম্বানির রিলায়েন্স গোষ্ঠীকে দেউলিয়া হবার হাত থেকে বাঁচাতেই, রক্ষাকর্তা হিসেবে হাজির হয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। 'হ্যাল'-এর পরিবর্তে অনিল আম্বানিকে এই বরাত পাইয়ে দেওয়া যে একান্তই ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত। □

প্রসঙ্গ ঃ আসামে এন আর সি

মানস কুমার বড়ুয়া

দেশে সমসাময়িক বিতর্কিত ইস্যুগুলির মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হল আসামে এন আর সি বা ন্যাশনাল রেজিস্টার অব সিটিজেন তৈরির প্রক্রিয়া চালু করা। এন আর সি বিষয়টি একটি জাতীয় বিষয়। ভারতের বিধিবদ্ধ নাগরিক নির্দিষ্ট করার বিষয়টি একটি রাজ্যের বিষয় শুধু নয়, এটা সমগ্র দেশের বিষয়। এটা ঠিক এন আর সি প্রক্রিয়ায় সীমান্ত বর্তী রাজ্যগুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, পাঞ্জাব ইত্যাদি রাজ্যে প্রতিবেশী রাষ্ট্র থেকে উদ্বাস্তু মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন নানা কারণে। এটা যেমন সঠিক, আবার আসাম সীমান্ত দিয়ে পূর্বতন পূর্ব পাকিস্তান বা বর্তমান বাংলাদেশ থেকে যে মানুষটি অনুপ্রবেশ করলেন তিনি আসামেই থেকে যাবেন এটা সর্বদা বাস্তব নয়। সুতরাং দেশের নাগরিক নির্ধারণ বা বিদেশী অনুপ্রবেশকারী চিহ্নিতকরণ কেবল একটি রাজ্যের বিষয় নয়। তাহলে হঠাৎ আসাম কেন? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলেই কিছু বিপজ্জনক দিক লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিশেষ করে এই মুহূর্তে কেন্দ্রে এবং ওই রাজ্যে যে শক্তি ক্ষমতায় আসীন তারা মানুষে মানুষে বিভাজনের ভয়ংকর খেলায় মত্ত। ধর্মের ভিত্তিতে, জাত-পাতের ভিত্তিতে মানুষের বিভাজন ঘটানো তাদের রাজনৈতিক কৌশল। তাদের কোনো উদ্যোগ সাদা চোখে দেখাটা বিভ্রান্তিকর হতে পারে। আসামে এন আর সি প্রক্রিয়া খতিয়ে দেখলে কিছু বিপজ্জনক প্রবণতা লক্ষ্য করা যাবে।

আসামে নাগরিক পঞ্জী নির্দিষ্টকরণের ক্ষেত্রে যেকোনো নাগরিকের ২৪ মার্চ ১৯৭১ মধ্যরাতের পূর্বে আসামে বা ভারতের যেকোনো রাজ্যে অবস্থানের বিধিসম্মত নমুনা দেখাতে হবে। ১৯৮৫ সালের আসাম চুক্তি অনুযায়ী এটা স্বীকৃত। প্রাথমিক খসড়া তালিকা প্রকাশিত হয় এবছর জানুয়ারিতে। সুপ্রীম কোর্টের সময়সীমা মেনে ৩০ জুলাই ২০১২ সম্পূর্ণ খসড়া তালিকা প্রকাশিত হয়। মোট আবেদনকারী ৩, ২৯,৯১,৩৮৪ জনের মধ্যে খসড়া তালিকায় নাম রয়েছে ২,৮৯,৮৩, ৬৭৭ জনের। বাদ গেছে ৪০,০৭, ৭০৭ জনের নাম। এই তালিকা প্রকাশের পর কেন ৪০ লক্ষ মানুষ বাদ পড়লেন এই প্রশ্নের উত্তরে এন আর সি কর্তৃপক্ষ বলেন এর কারণ প্রকাশ্যে বলা যাবে না। ৩০ জুলাই ২০১৮ থেকে ব্যক্তিগত ভাবে জানানো হবে এন আর সি সেবাকেন্দ্র থেকে। এই বক্তব্য বাদ পড়া মানুষের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি করেছে। এই বাদ পড়াদের সম্বন্ধে চারটি মাপকাঠির কথা বলা হয়েছে। বাদ পড়াদের মধ্যে 'ডি' বা সন্দেহজনক ভোটার ও তাঁদের পরিবারের সদস্য মোট ২,৪৮,০৭৭ জনের নাম আপাতত "কেপ্ট ইন হোল্ড" এ রাখা হয়েছে। বিদেশি ট্রাইবুনালে যাঁদের পাঠানো হয়েছে তাঁদের ও তাঁদের বংশধরদের নামও অন্তর্ভুক্ত হয়নি। ট্রাইবুনালের রায় দেখে তাঁদের নাম সংযোজন বা বিয়োজন হবে। বাকি ৩৭,৫৯,৬৩০ জনের নথি দেখে সন্তুষ্ট হতে পারেনি কর্তৃপক্ষ, তাই তাদের নাম বাতিল করা হয়েছে। এদের মধ্যে এমন মানুষও রয়েছেন যাদের নাম জানুয়ারির প্রথম খসড়া তালিকায় ছিল, কিন্তু উপযুক্ত নথি দেখাতে না পারায় এবারে তাদের নাম বাদ দেয়া হয়েছে।

সমগ্র প্রক্রিয়াটির মধ্যে প্রশ্ন ওঠার যথেষ্ট অবকাশ রাখা হয়েছে। প্রসঙ্গত, একটি ত্রুটিমুক্ত নাগরিক পঞ্জির খসড়া তালিকা প্রকাশের কথা ছিল গত ৩০ জুন '১৮। কিন্তু অসম সরকার ও জাতীয় মহাপঞ্জিয়ক (Register General of India)-এর অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ ও বাধাদানের ফলে নাগরিক পঞ্জি রুপায়নের কাজ শ্লথ হয়ে পড়ে। সুপ্রীম কোর্ট এরজন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে ভর্ৎসনা ও জাতীয় মহাপঞ্জিয়ককে সতর্ক করে। অবশেষে গভীর উৎকণ্ঠার মধ্যেই ৩০ জুলাই খসড়া তালিকা প্রকাশ করেন ভারতের মহাপঞ্জিয়ক শৈলেশ। তালিকা থেকে বাদ যাওয়া অধিকাংশ মানুষ গরীব, খেটে খাওয়া, যাঁদের অনেকের পক্ষেই তাঁদের পূর্বপুরুষ ভারতীয় হওয়ার প্রমাণ পেশ করা বাস্তব কারণেই সম্ভব নয়। তালিকা থেকে বাদ পড়ে গেছে আসামের প্রাক্তন এক মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের নাম, দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির পরিবারের নাম, ৩০ বছর ধরে সেনাবাহিনীতে কাজ করা সৈনিকের নাম। আশার কথা ৩১ জুলাই সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে ঐ তালিকার ভিত্তিতে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না। কিন্তু রক্তের স্বাদ পেয়ে গেছে বিজেপি। তাদের সভাপতি অমিত শাহ দাবি করেছেন যে একমাত্র তাঁরাই নাকি পারেন বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের দেশছাড়া করতে। যাঁদের নাম তালিকা থেকে বাদ গেছে তাঁরা সবাই নাকি অনুপ্রবেশকারী। অতএব যুদ্ধ নয়, দেশভাগ নয়, শুধুমাত্র কলমের খোঁচায় নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার উদ্যোগ ৪০ লক্ষ মানুষের। বিজেপির পশ্চিমবঙ্গ শাখা উস্কানীমূলকভাবে বলছে যে, এই রাজ্যেও নাগরিক পঞ্জি প্রক্রিয়া শুরু হবে এবং হিন্দু নয়, মুসলমান মানুষ যাঁরা বাংলাদেশ থেকে এসেছেন তাঁদের বিতাড়িত করা হবে। অর্থাৎ নাগরিকত্বের সমস্যাকেও সাম্প্রদায়িক রঙ চড়িয়ে দেখানো শুরু হয়ে গেছে।

যে রাজনৈতিক সহমতের ভিত্তিতে আসাম চুক্তি হয়েছিল তাতে নাগরিক পঞ্জির উদ্দেশ্য হিসাবে বলা হয়েছিল এটি একটি আইনসম্মত নাগরিক পঞ্জি হবে এবং এর ভিত্তিতে নির্বাচক তালিকা তৈরি হবে এবং যারা অনুপ্রবেশকারী তাদের নাম তালিকা থেকে বাদ যাবে। যদিও বর্তমান নির্বাচন কমিশন এই দাবীকে খণ্ডন করেছে। এ প্রসঙ্গে গত ১ আগস্ট মুখ্য নির্বাচন কমিশনের ও পি রাওয়াত জানিয়ে দিয়েছেন, এন আর সি তালিকায় নাম না থাকলেই ভোট দেওয়া যাবে না— এমন কোন কথা নেই। তিনি বলেছেন, এন আর সি মাপকাঠি এবং ভোটার তালিকার মাপকাঠি এক নয়।

অসম চুক্তিতে ছিল যেসব অনুপ্রবেশকারীদের ফেরত পাঠানো হবে ধর্মমত নির্বিশেষে। এখানেই বিজেপি সাম্প্রদায়িক তার তাস খেলছে এবং এন আর সি-কে ব্যবহার করে মুসলিম সংখ্যালঘুদের টার্গেট করতে চাইছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ২০১৬ সালে কেন্দ্রের মোদি সরকার "সিটিজেনশিপ (অ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল ২০১৬" নিয়ে আসে। তার আগে ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তে দুটি গেজেট নোটিফিকেশন করে, প্রথমটি হল "ফরেনার্স (অ্যামেন্ডমেন্ট) অর্ডার, ২০১৫", অপরটি হল "পাসপোর্ট (এন্ট্রি ইন ইন্ডিয়া) অ্যামেন্ডমেন্টস রুল্স ২০১৫।" এগুলির মাধ্যমে বলা হয় বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান থেকে আসা বেআইনী অধিবাসীদের মধ্যে হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি এবং খৃস্টানদের নাগকির অধিকার দেয়া হবে। অর্থাৎ একমাত্র মুসলমানদের ক্ষেত্রে তা দেয়া হবে না। আমাদের দেশের সংবিধানে নাগরিকত্ব ধর্মের ভিত্তিতে দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু হিন্দুরাষ্ট্রের ধ্বজাধারীরা ভারতের সংবিধানকে কতটা মর্যাদা দেয় তার প্রমাণ দেশবাসী ইতিমধ্যে পেয়ে গেছেন। একই লক্ষ্যে তারা দীর্ঘমেয়াদী ভিসা সংক্রান্ত আইনেও প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে চাইছে। এই প্রেক্ষাপটে জাতীয় নাগরিকপঞ্জী বা এন আর সি-র উদ্যোগকে দেখতে হবে আমাদের। আশীর দশকে যে অস্থিরতা আসামে বহু মানুষের প্রাণ কেড়েছিল সেই ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চাইছে বিভেদকামী শক্তি। এরাজ্যের মত আসামেও এই প্রচার করছে তারা যে যত নষ্টের গোড়া হচ্ছে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরা এবং মুসলিমরা, তথ্য যদিও বক্তব্যকে সমর্থন করছে না। আসামের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, বর্তমানে অসম গণপরিষদের বিধায়ক প্রফুল্ল কুমার মোহান্তি, ২৫ আগস্ট ২০১৪-তে আসাম বিধানসভায় এ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন। তার উত্তরে তরুণ গগৈ-এর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকার জানিয়েছিল যে, ২৫ আগস্ট ২০১৪ পর্যন্ত ৬৪,৩৮৭ জন বাংলাদেশী আসামে প্রবেশ করেছিল। যার মধ্যে ৬৪,১৬০ জন ফিরে গেছিল, ২২৭ জন রয়ে গেছিল। যারা এসেছিল তাদের মধ্যে ২৭,৩৭২ জন হিন্দু, ৩৬, ৯৯২ জন মুসলিম বাকি ২৩ জন অন্যান্য ধর্মাবলম্বী। ২৪ মার্চ ১৯৭১ পরবর্তী সময়ে বিশালসংখ্যক বাংলাদেশী আসামে বৈধ পাসপোর্টে প্রবেশ করেছে কিন্তু ফিরে যায়নি— এই প্রচারকে মিথ্যা প্রমাণিত করে উপরোক্ত তথ্য।

আরেকটি উস্কানিমূলক তত্ত্ব হল যে বিশালসংখ্যক অনুপ্রবেশকারী এবং বহিরাগতদের দ্বারা অসমীয়াদের এবং আসামের আদি বাসিন্দাদের নিজস্ব পরিচিত সত্ত্বা, ভাষা এবং সংস্কৃতি বিপদের সম্মুখীন। সুতরাং এন আর সি তাদের পরিচিত সত্ত্বা রক্ষায় ইতিবাচক ভূমিকা নেবে। ২০১১

ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় চতুর্থ কলম

রাজধানীতে শাসকের বুকে কাঁপন ধরাল ঐতিহাসিক মজদুর কিষাণ সংঘর্ষ সমাবেশ

বিগত ৫ সেপ্টেম্বর রাজধানী নয়াদিল্লীতে ১৫ দফা দাবীর ভিত্তিতে হাজার হাজার শ্রমিক-কৃষক-খেতমজুর ও অন্যান্য অংশের ২ লক্ষাধিক মানুষের ঐতিহাসিক সমাবেশ সংগঠিত হয়েছে। এই সমাবেশ কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত আর এস এস-বিজেপি সরকারকে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়েছে। এই হুঁশিয়ারির অর্থ হল কেন্দ্রীয় সরকারকে তার জনবিরোধী নব্য-উদারনীতির প্রয়োগ থেকে বিরত থাকা এবং হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির পরিণতিতে সৃষ্ট সমস্যাগুলি অবিলম্বে বন্ধ করতে পদক্ষেপ নেওয়া। এই গুরুত্বপূর্ণ বিশাল ঐতিহাসিক সমাবেশের পূর্বে ৯ আগস্টের দেশব্যাপী সফল জেলভরো আন্দোলন ৫ সেপ্টেম্বরের জমায়েতের সাফল্যকে নিশ্চিত করে দিয়েছিল। এই সমাবেশের ১৫ দফা দাবি সনদের মধ্যে রয়েছে— কর্মসংস্থান, ন্যুনতম মজুরী, সমকাজে সমবেতন, শ্রম আইনের শ্রমিক স্বার্থবিরোধী সংস্কার বন্ধ, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বেসরকারীকরণ-বিলুপ্তকরণ রদ প্রভৃতি।

৯ আগস্টের জেলভরো আন্দোলনকে শাসকশ্রেণীর চরম আক্রমণের মুখে পড়তে হয়েছিল। কিন্তু আন্দোলনকারীদের অকুতভয় মানসিকতা ও হার না মানা জেদের কাছে মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়েছিল তারা। রক্তাক্ত হয়েও সেই সংগ্রামে জয়ী হয়েছিল সারা দেশের শ্রমিক-কৃষক-খেতমজুররা। আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা ঐক্য দেখা গেল রাজধানীর বুকে ৫ সেপ্টেম্বরের ঐতিহাসিক সমাবেশের মধ্য দিয়ে। নয়াদিল্লীতে এরকম ধরনের কর্মসূচীতে বহুবার অংশ নেওয়া পোড় খাওয়া সৈনিকদের বলতে শোনা গেল যে স্মরণকালের মধ্যে এত ঐক্যবদ্ধ বৃহৎ সমাবেশ তাঁরা দেখেননি।

৫ সেপ্টেম্বর সকাল থেকেই রাজধানীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার শ্রমজীবী মানুষ মিছিল শুরু করে পার্লামেন্ট স্ট্রীট অভিমুখে। এদের বড় অংশই আগেরদিন হাজির হয়েছিলেন রাজধানীতে এবং রামলীলা ময়দানে খোলা আকাশের নীচে রাত কাটিয়েছেন সমাবেশকে সফল করার উদ্দেশ্যে। সেদিন শ্রমজীবীদের মিছিলে রাজধানী নয়াদিল্লী কার্যত অবরুদ্ধ

হয়ে যায়। সমাবেশ সমাপ্ত হওয়ার কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত মিছিল আসতে থাকে সমাবেশ স্থলে। বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা মানুষ তাদের নিজস্ব ভাষায় স্লোগান মুখরিত মিছিল যেন বৈচিত্র্যের মধ্য ঐক্যের চিত্র তুলে ধরেছিল। সাম্প্রদায়িকতা, দলিতদের উপর আক্রমণের বিরুদ্ধেও সোচ্চার ছিল মিছিলগুলি। রাজধানীতে বৃষ্টির ভ্রুকুটি ছিল, তাকেও উপেক্ষা করে মিছিল এগিয়েছে সমাবেশের দিকে।

এদিনের সমাবেশ পরিচালনা করে কে হেমলতা (সভাপতি সি আই টি ইউ), অশোক ধাওয়ালে (সভাপতি, সরা ভারত কিষাণ সভা) এবং থিরুণাভাক্কারাসু (সভাপতি, সারা ভারত খেতমজুর ইউনিয়ন)-কে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী।

সমাবেশে সি আই টি ইউ-র সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তপন সেন বলেন, আগামী ২৮ থেকে ৩০ নভেম্বর দেশের রাজধানীর উদ্দেশ্যে তিনদিনের একটানা লঙ মার্চে শ্রমিকরাও সমর্থন জোগাবে। এই সমাবেশে বিরাট অংশের মানুষ সমবেত হলেও এর বাইরেও গোটা দেশের গাঁ-গঞ্জ, শহরে আরও বহু শ্রমিক কিষাণ রয়েছেন, যাঁরা এখানে নেই। তাঁদের কাছে এবার পৌঁছতে হবে। বিকল্প নীতির ভিত্তিতে লড়াই করে কেন্দ্রের সরকারকে পরাস্ত করতে হবে।

কৃষক সভায় সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক হান্নান মোল্লা বলেন, গত চারবছরে মোদি সরকার কৃষকদের সাথে চরম বেইমানী করেছে, আজকের লড়াইয়ের প্রত্যয় হলো সবাই একজোট থাকলে শাসকের আক্রমণের মোকাবিলা করা সম্ভব। খেতমজুর সংগঠনের ব্রিজলাল ভারতী বলেন, এই ভারী বৃষ্টির মরশুমে গ্রামের খেতমজুরদের কাজ নেই। আর এমন কঠিন দিনে রাতের আশ্রয়ের জন্য খেতমজুরদের ঘর পর্যন্ত নেই।

এদিনের সমাবেশে ব্যাঙ্ক-বীমা-রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র সহ অন্যান্য সংগঠনের পক্ষ থেকেও সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখা হয়। সারাভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের চেয়ারম্যান সুভাষ লাম্বা এই ঐতিহাসিক সমাবেশকে সংহতি ও দাবিগুলিকে সমর্থন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। বিভিন্ন রাজ্য থেকে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের উল্লেখযোগ্য অংশ এই সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে সাধারণ সম্পাদক বিজয় শংকর সিংহ, যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী সহ দশজন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। □

মানস কুমার বড়ুয়া

আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ সময়কে ব্যবহার করতে চাই চেতনাদৃপ্ত সংগঠন

বিশ্বজিৎ গুপ্তচৌধুরী
যুগ্ম সম্পাদক, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি

বর্তমান সময়ে দেশের মানুষের জীবনযাত্রার ওপর মারাত্মক আঘাত নেমে এসেছে। এমন সব নীতি নিয়ে কেন্দ্রের বর্তমান সরকার চলছে যেগুলি সাধারণ মানুষের উপর ক্রমশ অর্থনৈতিক বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে। আকাশছোঁয়া দাম হয়েছে পেট্রল-ডিজেলের, পৌঁছেছে এযাবৎ সর্বোচ্চস্তরে। রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারের দামেরও সীমাহীন বৃদ্ধি ঘটানো হয়েছে, যদিও আর্থিক দিক থেকে দুর্বল পরিবারগুলিকে ভরতুকিতে গ্যাস দেওয়া হচ্ছে বলে বিজ্ঞাপনে গালভরা প্রচার চালাচ্ছে সরকার। গ্রামীণ জীবনে দুর্দশা বেড়েই চলেছে। স্বাধীন ভারতে গ্রামীণ অর্থনীতিতে এই সরকারের চার বছরের মতো বিপর্যয় আগে কখনও দেখা যায়নি। গ্রামীণ মজুরী বৃদ্ধির হার সর্বনিম্ন মাত্রায় নেমেছে। নয়া উদারনীতি কার্যকর করার ফলে দেশের সর্বস্তরের মানুষ আক্রান্ত। আক্রান্ত দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, সামাজিক সুরক্ষার মতো মানবোন্নয়নের মূল ক্ষেত্রগুলি। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তার প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে দেশে বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগ বেড়েছে। কিন্তু তার সিংহভাগ উৎপাদনশীল ক্ষেত্রে নয়, ফাটকা পুঁজির মাধ্যম হিসাবে শেয়ার বাজারে নিয়োজিত। সাধারণ আমানতকারীদের উৎসাহিত করা হচ্ছে বন্ড কিনতে। তার প্রত্যক্ষ প্রভাব পরছে স্বল্প সঞ্চয়ে। প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুদের হার ক্রমশ নিম্নগামী। অন্যদিকে বেপরোয়াভাবে দেশের ব্যাঙ্ক, বীমা, খনি, রেল সহ গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প সংস্থাগুলির বিলগ্নিকরণ ও বেসরকারিকরণের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। কর্মহীন হয়ে যাচ্ছেন দেশের বিপুল অংশের শ্রমজীবী-সাধারণ মানুষ। বিজেপি-র নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল বছরে ২ কোটি বেকারের কর্মসংস্থান। প্রকৃত চিত্রটা কি? কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমমন্ত্রকের পরিসংখ্যান বলছে, ২০১৩-১৫ তে উচ্চশিক্ষিত ২ কোটি ৬০ লক্ষ তরুণ-তরুণীর মধ্যে কর্মসংস্থান হয়েছে মাত্র ২০ লক্ষের। ২০১৬-১৭ সালের প্রথম ৯ মাসের তথ্য বলছে ৮৮ লক্ষ নতুন বেকার বাহিনীর মধ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে মাত্র ১ লক্ষ ৯০ হাজারের। এদের অধিকাংশের নিয়োগ সামান্য মজুরী (মাসে ৫-৬ হাজার টাকা), দিনে ১০ ১২ ঘণ্টা কাজ এবং কোন ধরনের সামাজিক সুরক্ষা বা অবসরকালীন সুযোগ সুবিধার আওতাধীন না হওয়ার শর্তের বিনিময়ে। দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের নির্দেশকে (সমকাজে সমবেতন) অমান্য করেই। জীবন ধারণের তাগিদে যে কোন ধরনের শর্তের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করা হচ্ছে।

নতুন কর্মসংস্থান তো দূরের কথা, কালো টাকা উদ্ধারের ধুয়ো তুলে নোট বাতিলের হঠকারী সিদ্ধান্ত এবং সারা দেশে পণ্য ও পরিষেবার উপর একই হারে শুল্ক চাপানো— এই দ্বিমুখী আক্রমণের ফলে দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায় যে সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে, তার প্রভাব থেকে দেশের অর্থনীতি মুক্ত হয়নি। শুধুমাত্র 'কালো টাকা' উদ্ধারের নাটকের ফলে ৪৫ লক্ষ মানুষ কর্মহীন হয়েছেন। সরকারী তথ্য অনুযায়ী গত ১ বছরে ই এস আই এবং পি এফ-এর আওতা থেকে বাদ পড়েছে ৬৩ লক্ষ মানুষ। অর্থাৎ এই সংখ্যক মানুষ নতুন করে কাজ হারিয়েছেন। নিয়োগ নেই সরকারী দপ্তরে। শূন্যপদের সংখ্যা ক্রমশ উর্দ্ধমুখী। সারা দেশজুড়ে বেকারত্ব যখন বাড়ছে, তখন গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো টাকার অবনমন এবং পেট্রোপণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে। বিশ্ব বাজারে তেলের দাম যখন কমছে, তখন মোদী সরকার নয় বারে পেট্রপণ্যের উৎপাদন শুল্ক বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি ঘটিয়েছে। একই সাথে ভ্যাট থেকে রাজ্যগুলির আয় ১,৩৭,১৫৭ কোটি টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ১,৮৪,০৯১ কোটি টাকা। কাদের ঘরে যাচ্ছে এই টাকা? ২০১৮-১৯ আর্থিক বাজেটের মধ্য দিয়ে বৃহৎ পুঁজির স্বার্থরক্ষায় ৭০০ কোটি টাকা কর ছাড় দেওয়া হয়েছে। বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী বা কর্পোরেট সংস্থার ১১ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি বকেয়া ঋণ উদ্ধারের জন্য কোন পদক্ষেপ কেন্দ্রীয় সরকার নিচ্ছে না। কর্পোরেট স্বার্থ রক্ষার তাগিদে মানুষের জীবনমানের উপর অবিরাম আঘাত আসছে। অর্থনীতির এই দুরাবস্থার দায় যেন সাধারণ মানুষের। জনগণকেই কৃচ্ছসাধন করতে বাধ্য করা হচ্ছে। আর সেই কৃচ্ছসাধনের ফল তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করছে সাধারণ মানুষের রক্ত, ঘামের বিনিময়ে কষ্টার্জিত অর্থ লুঠ করে বিদেশের মাটিতে গা ঢাকা দিয়ে থাকা প্রধানমন্ত্রীর আশীর্বাদধন্য ভারতের চার মহান(!) সন্তান। প্রত্যক্ষ সরকারী মদতে দেশের মধ্যে অবস্থান করে এরকম আরও অনেকেই দেশ ও দেশের মানুষের সম্পদ নির্বিচারে লুঠ করে যাচ্ছে। ফলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য অনেক বেশি ব্যাপকতা লাভ করেছে এই সময়ে। মানুষের জীবন জীবিকার ওপর বহুমাত্রিক আক্রমণ সংগঠিত হচ্ছে। খেতের কৃষক, কারখানার শ্রমিক থেকে শুরু করে মধ্যবিত্তের অংশ হিসেবে প্রশাসনের কর্মচারী কেউই এই আক্রমণের ছোবল থেকে ছাড় পাচ্ছেন না। কিন্তু এই চিত্রটাই সব নয়।

দ্বান্দ্বিক বিচারে এর বিপরীতে প্রতিবাদী কণ্ঠ ধ্বনিত হচ্ছে। মহারাষ্ট্রের কোরেগাঁওয়ে দলিতদের বিক্ষোভ, নাসিক থেকে মুম্বাইয়ে শ্রমিক-কৃষকদের অন্তহীন পথ চলায়, রাজস্থানের খেতে খামারে, হরিয়ানায় শ্রমিকদের ধর্মঘটে, ব্যাঙ্ক ও গ্রামীণ ডাক শিল্পে লাগাতার ধর্মঘটে প্রতিদিন দেশের সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের ছবি আঁকা হচ্ছে। যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে ৫ সেপ্টেম্বর, '১৮ দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ধরনায়। সংগ্রামের এই ছবি বিবর্ণ করতে পরিকল্পিতভাবে সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা, ঘৃণা, বিদ্বেষ ছড়ানো হচ্ছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতাকে পরিচালিত করা হচ্ছে তীব্র মেরুকরণ ও বিভেদের লক্ষ্যে। ধর্মকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। ব্যবহার করা হচ্ছে সংবিধানকেও। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় মানুষের প্রতিবাদী কণ্ঠকে স্তব্ধ করার স্বৈরতান্ত্রিক চক্রান্ত ক্রমশ বিস্তার লাভ করছে।

সাম্প্রদায়িকতার এই প্রতিযোগিতায় আজ পশ্চিমবঙ্গও পিছিয়ে নেই। কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় শাসক দলের প্রত্যক্ষ মদতে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ, ধর্মীয় উৎসবকে কেন্দ্র করে অস্ত্রের দাপট, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সরকারী অর্থ সাহায্য পরিবর্তিত বাংলার নতুন বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের ঐতিহ্যের বাংলায়, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাংলায় গণতন্ত্রের ধ্বংস যজ্ঞের ওপর লম্পঝম্প করছে মোদি এবং সংঘ পরিবারের সঙ্গে মিতালিতে আবদ্ধ এ রাজ্যের শাসকদল। ধর্মীয় মেরুকরণের অস্ত্রে মানুষের জীবন-জীবিকার সমস্যার বাজিমাত করতে চায় উভয় শাসকদলই। সাম্প্রদায়িকতার বিপজ্জনক আগুন নিয়ে খেলার আসল উদ্দেশ্য ধর্মীয় মেরুকরণের আড়ালে চাপা দেওয়া মানুষের রুটি-রুজির মতো গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। ঋণের জালে দেশে আত্মঘাতী কৃষকের করুণ চিত্রের বাইরে নেই পশ্চিমবঙ্গও। ফসলের দাম না পেয়ে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছেন বাংলার চাষি। বন্ধ কারখানা বা চা বাগান শ্রমিকদের নিদারুণ যন্ত্রণাকে প্রতিশ্রুতির মোহজালে আড়াল করার চেষ্টা দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে না। তাই প্রতিবাদী মানুষের ভীড় বাড়ছে সর্বত্রই। কলে-কারখানায়, কলেজের গেটে, রাস্তায়। উত্তাপ বাড়ছে রাজ্য প্রশাসনের অভ্যন্তরেও। বকেয়া মহার্ঘভাতা, বেতন কমিশন দ্রুত চালু করার দাবিকে কেন্দ্র করে কর্মচারীদের পুঞ্জিভুত ক্ষোভ যে কোন সময়ে বিস্ফোরিত হবে। কারণ পশ্চিমবাংলার রাজ্য সরকারী কর্মচারী, পঞ্চায়েতের কর্মচারী বা শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা সবকিছু মুখ বুজে মেনে নেবে না। কর্মচারীদের জরুরী বিষয়গুলি বারবার উপেক্ষিত হবে, আর কর্মচারীরা মুখ বুজে সব বঞ্চনাকে মাথা পেতে মেনে নেবে, এ কখনও হতে পারে না। ইতিমধ্যে একাধিকবার ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটেছে। কিন্তু যে সরকার গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত প্রতিবাদ আন্দোলনকে নানান প্রক্রিয়ায় দমন করতে চায়, যে সরকার কোর্টে অবলিলায় বলতে পারে 'কর্মচারীদের কোন মহার্ঘভাতা বকেয়া নেই' বা 'মহার্ঘভাতা কর্মচারীদের অধিকার নয়' তাদের কাছ থেকে দাবি ছিনিয়ে আনতে গেলে হার না মানা লড়াই একমাত্র পথ। কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের অর্জিত অধিকার, যে অধিকার অর্জনের জন্য দীর্ঘ লড়াই-সংগ্রাম করতে হয়েছে। রাজ্যে প্রথম যুক্তরাষ্ট্র সরকার ও পরবর্তীতে বামফ্রন্ট সরকার সেই লড়াইকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। এই অধিকার অর্জনের জন্য আদালতের দারস্থ হতে হয়নি। এই প্রজন্মের কর্মচারী মানসে ভ্রান্ত ধারণা তৈরী করে দেওয়া হচ্ছে, যেন আইনী প্রক্রিয়াই একমাত্র পথ। স্মরণে রাখা প্রয়োজন লড়াই থেকে গা বাঁচিয়ে ভিন্ন পথ অবলম্বন করে কোন অধিকার অর্জন তো দূরের কথা, রক্ষা করাও যায় না। অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই। রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। তাই সময় এসেছে সেই হার না মানা মনোভাব নিয়ে পথে নামার। কারণ এখন শুধু আর্থিক বঞ্চনাই একমাত্র বিষয় নয়, আক্রান্ত আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার, আমাদের আত্মমর্যাদা। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দাবি উত্থাপন করা যদি অন্যায় হয়, তাহলে বৃহত্তর স্বার্থে সেই অন্যায় বাড়ে বাড়েই করা হবে। ন্যায্য দাবি করলে হুমকি দেওয়া, যত্রতত্র বদলি করা হবে, আর আমরা তা মেনে নেব? মেনে নিইওনি আমরা। যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে একাধিকবার বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে। সদ্য সমাপ্ত ৩০ আগস্ট, '১৮ রাজ্যব্যাপী মহামিছিলে কর্মচারীদের দৃপ্ত পদচারণা পুনরায় প্রমাণ করেন তাঁরা, শাসকের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রতি আস্থাশীল। সংগঠনের আহ্বানে ধারাবাহিক সংগ্রাম সাফল্যমণ্ডীত হওয়া সত্ত্বেও, আমাদের বহু বন্ধু এখনও রাস্তায় নামতে ইতস্তত করছেন। বঞ্চনা ও ক্ষোভ যে তারমধ্যে জমছে না, তা নয়। নানান পারিবারিক-সামাজিক প্রতিবন্ধকতা হয়তো সেই ক্ষোভকে স্তিমিত করে দিচ্ছে।

অন্যায়-অবিচারের সাথে কখনও আপস করে থাকা যায় না। শাসক, তা সে যতই স্বৈরতান্ত্রিক হোক না কেন, ভয় পায় ঐক্যবদ্ধ রূপকে। তাই আসুন, শাসকরা যাতে ভীত, সেই অস্ত্রকে জোড়ালো করি। লাগাতার আন্দোলনের চাপে শাসকের হাত থেকে দাবি ছিনিয়ে নিতে, বিভেদের মেরুকরণের রাজনীতিকে রুখে দিতে, গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করতে সমস্ত বাধার শেকল ছিঁড়ে লড়াকু ঐক্যবদ্ধ কর্মচারী সমাজ তৈরী করি, যে সমাজ কোন দানবের কাছে মাথা নোয়াবে না। স্বপ্ন দেখাবে, স্বপ্ন দেখাতে শেখাবে। নতুন সুর্যোদয়ের লড়াইয়ের ময়দানে থাকার এটাই শ্রেষ্ঠ সময়। আসুন সেই সময়কে কাজে লাগাতে বৃহত্তর সংগ্রামে নিজেদের যুক্ত করি। জয় আমাদের নিশ্চিত। □

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতি

২৭ আগস্ট ২০১৮ অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কর্মসূচী

২৭ আগস্ট ২০১৮ কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ভবনে রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত স্মরণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি শ্যামচাঁদ মণিগ্রাম। 'সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় মৌলবাদ রবীন্দ্র নজরুল' বিষয়ের উপর আলোচনা করেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ও বিশিষ্ট গবেষক ডঃ শুভঙ্কর চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন কলকাতা কর্পোরেশনের প্রাক্তন মহানাগরিক তথা বিশিষ্ট আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য ও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিংহ।

আলোচক ডঃ শুভঙ্কর চক্রবর্তী

অনুষ্ঠানের প্রারাম্ভে স্বাগত ভাষণ দেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুশীল ব্রহ্ম। কেরলে শতাব্দীর ভয়ঙ্করতম বন্যায় বিপর্যস্ত আর্ত মানুষদের সৌভ্রাতৃত্বের প্রতি নিদর্শন হিসাবে প্রাথমিক পর্যায়ে সমিতির পক্ষ থেকে সাধারণ সম্পাদক রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদকের হাতে ৫ লক্ষ টাকার একটি চেক তুলে দেন। চেক গ্রহণ করে তিনি সমিতির এই মহতী উদ্যোগের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

পরবর্তীতে আলোচ্য বিষয়ের উপর আলোচনা করতে গিয়ে ডঃ শুভঙ্কর চক্রবর্তী বলেন, ভারতবর্ষের সভ্যতা, ইতিহাস ও ঐতিহ্য এতই ঠুনকো নয় যে কোন ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক শক্তি দেশের ঐক্যকে ভেঙে দিতে পারে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে অতীতেও ঐক্য বজায় ছিল, বর্তমানেও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। পরাধীন ভারতে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশরা নিজেদের শাসন ব্যবস্থা বজায় রাখতে হিন্দু-মুসলিম মানুষের ঐক্যকে ভাঙতে যে বিভেদের বীজ বপন করতে চেষ্টা করেছিল, আজকের দিনেও কিছু ধর্মীয় মৌলবাদী শক্তি রাজনৈতিক ছত্রচ্ছায়ায় সেই একই পথকে অনুসরণ করে চলেছে যা কুৎসিত, বর্বর। আমাদেরকে এর বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে লড়াই আন্দোলনে শামিল হতে হবে। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল তাঁদের লেখনীর মাধ্যমে সবরকমের ধর্মান্ধতা ও বিভেদের বিরুদ্ধে বারবার সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। প্রবন্ধ-গান-কবিতায় এঁরা ধর্মীয় সহিষ্ণুতার কথা বলেছেন, জীবনের জয়গান গেয়েছেন। আমাদের তাঁদের অমূল্য রচনাগুলি পড়ে নির্দিষ্ট পথের সন্ধান করে নিতে হবে।

পেনশনার্স সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুশীল ব্রহ্ম রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিংহের হাতে কেরালার তহবিলে সাহায্য তুলে দিচ্ছেন।

দুইজন মনীষিই নিজেদের লেখনীতে গরিব মানুষের সামাজিক-আর্থিক ও শিক্ষাগত অসাম্যতার কথা তুলে ধরে দরিদ্র মানুষকে তাঁরপ্রাপ্য অধিকার ও মর্যাদা দিয়ে সমপর্যায়ে উন্নীত করার কথা বলে গিয়েছেন। রাজ্যের শাসকদল একটি রিজিওনাল পার্টি, এদের চরিত্রও নেতিমূলক।

এরপর তিন পর্যায়ের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের অন্যতম ছিল রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্তের রচনা থেকে আবৃত্তি ও গানের মাধ্যমে একটি আলেখ্য। দ্বিতীয় পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'কর্ণকুন্তী সংবাদ' পরিবেশিত হয়। পরিবেশন করেন 'বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য ও চিরশ্রী মুখার্জী'। চরিত্র দুটি রূপায়নে দক্ষতা ও সাবলীলতা প্রকাশ পেয়েছে। সর্বশেষে অনুষ্ঠিত শ্রুতি নাটক 'মুসলমানীর গল্প'-এর নাট্যরূপদান ও পরিচালনা করেন সমীক সেনগুপ্ত। শ্রুতি নাটকটির পরিবেশনা সময়ের উপযোগী ও তাৎপর্যপূর্ণ। সভার সভাপতি উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সমাপ্ত করেন। □

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কলকাতায় কেন্দ্রীয় মিছিল

উপেক্ষা করে বিকাল ৫টা থেকেই উপস্থিত হতে থাকে ধর্মতলায়। বিকাল ৫.৪৫ মিনিটে শ্লোগানে মুখরিত রক্তপতাকাবাহী হাজার হাজার কর্মচারীর মিছিল লেনিন মূর্তির পাদদেশ থেকে শুরু হয়ে লেনিন সরণি ধরে মৌলালী হয়ে শিয়ালদহ বিগবাজারের উদ্দেশ্যে এগিয়ে চলে। কর্মচারীদের হাতে হাতে দাবী সম্বলিত প্ল্যাকার্ড যেখানে কোনোটায় দাবি রয়েছে সমকাজে সমবেতনের, কোনোটায় রাজ্যের গণতন্ত্র রক্ষার দাবি, কোনোটায় চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ ও স্বাস্থ্যবীমায় অন্তর্ভুক্তির দাবি। মিছিলে ছিল দুটি সুসজ্জিত ট্যাবলো যেখানে কর্মচারীদের দাবীগুলি ফ্লেক্সের মাধ্যমে ঝোলানো ছিল পথচলতি মানুষদের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে। মিছিলে উপস্থিত কর্মচারীরা দাবি তুললেন শূন্যপদ পূরণের, বকেয়া মহার্ঘভাতার, বেতন কমিশনের সুপারিশ দ্রুত প্রকাশ ও কার্যকর করার, দেশজুড়ে চলা সাম্প্রদায়িকতা ও বিভেদের বিরুদ্ধেও সোচ্চার হলেন তাঁরা। মিছিলে উপস্থিত বাম পরিষদীয় দলনেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, বিজেপি সরকারের মতো বর্তমান রাজ্য সরকারও মানুষের বাকস্বাধীনতায় লাগাম দেয়। দুই সরকারই মানুষকে ভাঁওতা দেয়। বঞ্চনা করে গরীব মানুষের সঙ্গে। তাই এই লড়াই সরকারী কর্মচারীদের একার লড়াই নয়। সমাজের সমস্ত শ্রেণীর মানুষকে একসঙ্গে লড়াইতে নামতে হবে। এছাড়াও এদিনের মিছিলে ছিলেন এবিটিএ-র সাধারণ সম্পাদক কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, এবিপিটিএ-র সাধারণ সম্পাদক সমর চক্রবর্তীসহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃত্ব ও কর্মীরা।

বর্তমান রাজ্য সরকারের ৭ বছর সময়কালে ঘটে চলা বঞ্চনার বিরুদ্ধে এদিনের মিছিলে রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা যেমন শ্লোগান তুলেছেন, তেমনি কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের স্বেচ্ছাচারিতা ও একনায়কতান্ত্রিক মনোভাবের বিরুদ্ধেও তীব্র ক্ষোভ ধ্বনিত হয়েছে লাল ঝাণ্ডার দৃপ্ত মিছিল থেকে। শিয়ালদহ বিগবাজারের সামনে মিছিল এসে পৌঁছানোর পরবর্তীতে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় মিছিলে অংশগ্রহণকারী সকলের পৌঁছানোর জন্য। যদিও শ্লোগান এক মুহূর্তের জন্যও থেমে থাকেনি।

মিছিলের সমাপ্তিতে শিয়ালদহ বিগবাজারের সামনে মিছিলে অবস্থানকারী একটি ট্যাবলোকে অস্থায়ী মঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করে এক সংক্ষিপ্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বিজয়শঙ্কর সিংহ তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের শুরুতেই বিপুল পরিমাণে বকেয়া মহার্ঘভাতা অবিলম্বে মিটিয়ে দেওয়ার দাবি করে বলেন, বকেয়ার পরিমাণ প্রতিনিয়ত বাড়ছে। কবে সরকার এর সমাধান করবে? বেতন কমিশন গঠন হওয়ার পরবর্তীতে প্রায় তিনবছর অতিক্রান্ত হতে চলেছে কিন্তু কমিশনের চেয়ারম্যান নিজ দায়িত্ব প্রতিপালনের পরিবর্তে বর্তমান রাজ্য সরকারের শাসকদলের মঞ্চ আলোকিত করছেন। আমাদের অভিজ্ঞতা পাঁচ-পাঁচটি বেতন

কমিশন প্রকাশ ও কার্যকর করেছেন পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট বা যুক্তফ্রন্ট সরকার। বর্তমান রাজ্য সরকারের সময়কালে রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা তাদের নিজ দাবিতে লড়াই আন্দোলনে শামিল হলে নীতিহীনভাবে বদলি করা হচ্ছে, শূন্যপদে স্থায়ী নিয়োগের পরিবর্তে চুক্তির ভিত্তিতে কমবেতনে কর্মী নিয়োগ করা হচ্ছে। বেকার যুবক-যুবতীদের পরিবর্তে অবসরপ্রাপ্তদের পুনর্নিয়োগ করা হচ্ছে। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি দাবি জানাচ্ছে ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশ দ্রুত প্রকাশ ও কার্যকর করতে হবে, শূন্যপদে স্থায়ী কর্মী নিয়োগ করতে হবে পি এস সি-র মাধ্যমে স্বচ্ছতার সঙ্গে। অবসরপ্রাপ্তদের পুনর্নিয়োগের পরিবর্তে বেকার যুবক যুবতীদের শূন্যপদে নিয়োগ করতে হবে। চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের সমকাজে সমবেতন দিতে হবে, তাদের স্বাস্থ্যবীমায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের সপ্তম বেতন কমিশনের পরবর্তীতে রাজ্য সরকারের একজন গ্রুপ-ডি কর্মচারীর বেতনের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের গ্রুপ-ডি কর্মচারীর বেতনের বিপুল ফারাক ঘটেছে। রাজ্য সরকার যদি অবিলম্বে এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহন না করে। তাহলে এর বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হবে রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা। আগামী ২৬ নভেম্বরের মধ্যে বেতন কমিশন কার্যকর না হলে প্রয়োজনে নবান্নকে অবরুদ্ধ করে দেওয়া হবে।

মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের অভিনন্দন জানিয়ে সুজন চক্রবর্তী বলেন, এই মিছিল শুধু আপনাদের নয়, যারা আপনাদের বদলি করেন, মিথ্যা মামলা দেন, এমনকি লাঠিপেটা করার জন্য তৈরী থাকেন, তাঁদের জন্যও আপনারা লড়াই করেছেন, এটা তাঁদের বোঝাতে হবে। আপনাদের প্রতিটি দাবীই সংগত দাবী।

বকেয়া মহার্ঘভাতার টাকা কিভাবে লোপাট হচ্ছে তা সবার জানা দরকার। সরকারী কর্মচারীদের ডি এ বকেয়ায় রাজ্য গোটা দেশের শীর্ষে। এদিকে মুখ্যমন্ত্রী বলছেন বিগত সরকারের ঋণের কারণে তিনি ডি এ দিতে পারছেন না। তিনি মিথ্যা কথা বলছেন। সরকারের টাকা না থাকলে মেলা-খেলা-উৎসবের নামে কোটি কোটি টাকা সরকার খরচ করছেন কিভাবে? মুখ্যমন্ত্রীসহ মন্ত্রিসভার সদস্যদের বেতন বাড়লো কিভাবে? আসলে বিষয়টি হচ্ছে শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গির। তাই বামফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী একজন গ্রুপ-ডি কর্মচারীর থেকে কম বেতন নিতেন। কিভাবে তোলাবাজি চলছে, কিভাবে সিন্ডিকেট রাজ চলছে সেসব জানতে হবে সবার, জানাতেও হবে। সারা দেশেই চলছে এক অঘোষিত জরুরী অবস্থা। যে সরকারের মতে মত দেবে না সেই দেশদ্রোহী হয়ে যাচ্ছে। এই রাজ্যেও তাই হচ্ছে। এর বিরুদ্ধেও আমাদের সবার আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। বর্তমান রাজ্য সরকারের শাসনকালে গোটা রাজ্যজুড়ে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা দারুণভাবে আক্রান্ত। কৃষক-শ্রমিক-মেহনতী মানুষের ওপর নিদারুণ আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের টেট পরীক্ষা থেকে স্কুল সার্ভিস কমিশন সব ক্ষেত্রেই দুর্নীতির অভিযোগ উঠছে। যে পি এস সি রাজ্যের সরকারী কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করতো আজ সেখানেও দুর্নীতির অভিযোগ উঠছে। নিতান্ত কমবেতনে চুক্তির ভিত্তিতে সরকারী দপ্তরে নিয়োগ করা হচ্ছে, সমকাজে সমবেতনের দাবি মানা হচ্ছে না। আমরা দাবি করছি চুক্তির ভিত্তিতে নয়, শূন্যপদে স্বচ্ছতার ভিত্তিতে বেকার যুবক-যুবতীদের নিয়োগ করা হোক। চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের নূন্যতম ১৮,০০০ টাকা বেতন দিতে হবে। শিক্ষক নিয়োগে টালবাহানা বন্ধ করে স্বচ্ছতার সঙ্গে দ্রুত নিয়োগ করতে হবে। গোটা রাজ্যজুড়েই কৃষক-শ্রমিকরা লালঝাণ্ডা কাঁধে নিয়ে মিছিলে সমবেত হচ্ছেন লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে দাবি অর্জন করার জন্য। শ্রমজীবি মানুষের অংশ হিসাবে এ রাজ্যের রাজ্য সরকারী কর্মচারী সমাজ ও শিক্ষকমহাশয়েরাও সেই লড়াইতে শামিল থাকবেন এই বিশ্বাস পশ্চিমবঙ্গের বামগণতান্ত্রিক মানুষের প্রতিনিধি হিসাবে আমার রয়েছে। সর্বশেষে এই শপথ নিয়েই কর্মচারীরা সমাবেশস্থল পরিত্যাগ করেন যে আগামী ২৬ নভেম্বরের মধ্যে পে কমিশনের সুপারিশ কার্যকর না হলে আরও বৃহত্তর লড়াইতে পশ্চিমবঙ্গের কর্মচারী সমাজ শামিল হবে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে। □

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রাজ্য মহিলা কনভেনশন

রাজনৈতিক পরিস্থিতিসহ কেন এই মহিলা কনভেনশন, আমাদের এই পরিস্থিতিতে কি করণীয় তা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন ও কনভেনশনকে উদ্বোধন করেন। কমরেড উদ্বোধক এই মহিলা কনভেনশনকে স্বাগত জানিয়ে বলেন— সামগ্রিক লড়াই আন্দোলন থেকে মহিলাদের লড়াই আন্দোলন কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। পুরুষ-মহিলা আমরা সবাই একসঙ্গে হাতে হাত ধরে, কাঁধে-কাঁধ মিলিয়ে লড়াই-আন্দোলনের ময়দানে থাকি। আমাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে— এই সমাজকে বদলে দেওয়া। ছাত্র-যুব-মহিলা-কৃষকসহ সংগঠিত-অসংগঠিত সর্বক্ষেত্রেই আমরা নিজের নিজের জায়গায় নিজের নিজের মতো করেই লড়াই আন্দোলন করছি। তিনি সেইসমস্ত মানুষদেরও অভিনন্দন জানান যেখানে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত সকলের জীবন-জীবিকার উপর যে আক্রমণ নেমে আসছে তাকে মোকাবিলা করেও যাঁরা বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এগিয়ে আসছেন। কেন এই কনভেনশন প্রসঙ্গে তিনি বলেন— এখনো আমাদের দেশে, রাজ্যে ও সমাজে লিঙ্গ-বৈষম্য বর্তমান আছে প্রকট ভাবে, আমাদের লড়াই করতে হবে এর বিরুদ্ধে। সমকাজে সম মজুরীর দাবীতে আওয়াজ তুলবে এই কনভেনশন। সমস্ত বাধা কাটিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার লড়াই এটা। সেই পুরনো আমল থেকেই মহিলাদের বাধা কাটিয়ে লড়াইয়ে শামিল হতে হয়। আবার একইভাবে পরিবার, সমাজ ও একজন নাগরিক হিসাবে বহু প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করেই আপনাদের বা একজন মহিলাকে সংগঠনে এগিয়ে আসতে হয়। আক্রমণ আসছে সাম্প্রদায়িকতার দিক থেকেও। সাধারণত যুক্তির যেখানে শেষ, সেখান থেকেই অত্যাচারের শুরু হয়। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থেই স্ত্রী স্বাধীনতাকে খর্ব করা হয়েছে। আরএসএস পরিচালিত বিজেপি সরকার মনুবাদী চিন্তাধারায় মহিলাদের ঘরের মধ্যে বন্দী করে রাখতে চায় তাহলে বাইরের জগত সম্বন্ধে কিছু জানার বিষয় থাকবে না। ফলত লড়াই-আন্দোলনের ময়দানেও তারা থাকবে না। প্রতিমুহূর্তে সমাজের দলিত, প্রতিবন্ধী মহিলাদের উপর আক্রমণ নেমে আসছে। গার্হস্থ্য হিংসা, নারী নির্যাতন, শিশুদের উপর আক্রমণ, কণ্যাভ্রূণ হত্যা চলছে প্রতিদিন।

কনভেনশনে উপস্থিত মহিলা প্রতিনিধিদের মিছিল

এইরকম একটি পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এইসমস্ত আক্রমণকে মোকাবিলা করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে একমাত্র প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে। সেই কৌশল স্ব-স্ব জায়গায় আপনারা ঠিক করবেন।

কনভেনশনের খসড়া প্রতিবেদন উত্থাপন করেন কেন্দ্রীয় মহিলা উপসমিতির আহ্বায়িকা সুতপা হাজরা। এই খসড়া প্রতিবেদনের উপর প্রথমদিন বিভিন্ন জেলা, অঞ্চল ও সমিতি থেকে ৩০ জন আলোচনা করেন। বিকাল ৫টায় সভাপতিমণ্ডলী সভা মুলতুবী ঘোষণা করেন।

৯ তারিখ সকাল ১০.৩০ মিনিটে উদ্বোধনী সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে মুলতুবী সভার কাজ পুনরায় শুরু হয়। পরবর্তীতে খসড়া প্রতিবেদনের উপর জেলা/অঞ্চল ও সমিতি থেকে আরো ১২ জন অর্থাৎ দুইদিন ধরে মোট ৪২ জন প্রতিনিধি আলোচনা করে প্রতিবেদনকে সমৃদ্ধ করে। কনভেনশন থেকে 'প্রতিবাদকে স্তব্ধ করার স্বৈরতান্ত্রিক চক্রান্ত'-এর বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিত গুপ্ত চৌধুরী এবং কনভেনশন থেকে এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সমগ্র আলোচনাকে গুটিয়ে জবাবী বক্তব্য পেশ করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের সহ সাধারণ সম্পাদক বিজয় শংকর সিংহ।

পরিশেষে খসড়া প্রতিবেদন সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এই কনভেনশন থেকে। শেষে সভানেত্রীর সমাপ্তি বক্তব্যর মধ্য দিয়ে এবং আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে কনভেনশনের কাজ শেষ হয়। সভায় প্রতিনিধির উপস্থিতি মোট ১৫৮ জন। □

(কনভেনশনের আরও ছবি অষ্টম পৃষ্ঠায়)

কুমকুম মিত্র

মহিলা কনভেনশন থেকে গৃহীত দাবি সমূহ

১। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ট্রেড ইউনিয়নের ক্ষেত্রে নারীদের সমমর্যাদা প্রদান এবং সম্পত্তির অধিকার সুনিশ্চিত করা। নারী ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সংসদ, বিধানসভা এবং নির্বাচিত সংস্থাসমূহে তাদের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি করতে হবে। ২। কর্মস্থল থেকে সমাজ সর্বত্র সুরক্ষা প্রদান করতে হবে। ৩। সমাজে ঘটে চলা সমস্ত অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক লড়াই জারি রাখতে হবে। ৪। বাণিজ্যিক প্রয়োজনে বিশেষত ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় মহিলাদের কমোডিটি হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না। ৫। মূল্যবৃদ্ধি রোধে সুষ্ঠ গণবন্টন ব্যবস্থা গড়ে তুলে খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। ৬। কর্মস্থলে মহিলাদের জন্য পৃথক শৌচালয় ও বিশ্রামকক্ষ গড়ে তুলতে হবে। ৭। মহিলা কর্মচারীদের শিশু সন্তানের জন্য কর্মস্থলের কাছাকাছি ক্রেশ-এর ব্যবস্থা করতে হবে। ৮। অফিস টাইমে মহিলাদের বিশেষত সন্তানসম্ভবাদের কথা ভেবে নির্দিষ্ট পরিবহন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৯। সংসদে ও বিধানসভাগুলিতে মহিলাদের জন্য এক তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণ করতে হবে। ১০। রাজ্যে মহিলাদের উপর ঘটে যাওয়া ক্রমবর্ধমান অত্যাচারে দোষীদের দ্রুত শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। নারীদের নিরাপত্তা প্রদানে পুলিশ প্রশাসনকে সদ্য সক্রিয় থাকতে হবে। ১১। প্রশাসনে শূন্যপদ পূরণ ও কাজের সুষ্ঠ পরিবেশ ফিরিয়ে ধর্মঘটসহ পূর্ণ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার প্রদান করতে হবে। □

চতুর্থ পৃষ্ঠার পর

আসামে এন আর সি

সালের ভাষাভাষী সংক্রান্ত পরিসংখ্যান যেটা এবছর জুলাই-এ প্রকাশিত হয়েছে, তাকে ব্যবহার করছে এই ধরনের তাত্ত্বিকেরা। উক্ত পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে ২০০১-এর তুলনায় ২০১১ তে অসমীয়া ভাষীর সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে, বাংলাভাষীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও হ্রাস বৃদ্ধির হার খুবই সামান্য এবং এর কারণ শুধু অনুপ্রবেশই নয়, তবুও একেই হাতিয়ার করছে অস্থিরতা সৃষ্টিকারী শক্তিগুলি।

কিন্তু সবচেয়ে ভয়ংকর বিপদ হল সাম্প্রদায়িক শক্তি পরিচিতিসত্ত্বা, ভাষা সংক্রান্ত তথাকথিত সংকটের সাথে হিন্দুত্বের মিশেল ঘটিয়ে দিতে চাইছে। ওদের বক্তব্য বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দুরা শরণার্থী, আর মুসলিমরা হল অনুপ্রবেশকারী। তারা এন আর সি-কে সমস্ত ভাষাগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মনে বাড়তি ভীতি সঞ্চারের কাজে ব্যবহার করছে। অসমের প্রকৃত নাগরিকদের নাগরিকত্ব সুরক্ষিত রাখার প্রশ্নে এখনও পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার কোন কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি। বিজেপি নাগরিকত্বের শর্ত হিসাবে ধর্মকে টেনে আনতে চাইছে যা অসাংবিধানিক।

যে ৪০ লক্ষাধিক মানুষের নাম এন আর সি-র চূড়ান্ত খসড়া তালিকা থেকে বাদ পড়েছে তাদের কোন তালিকা প্রকাশ করা যায়নি। তবে জানা গেছে যে ভাষিক সংখ্যালঘু, বাংলাভাষীরাই সংখ্যায় বেশি। হিন্দিভাষী, পাঞ্জাবি, নেপালি, কোচ, রাজবংশী, রাজ্যস্থানি ও অন্যান্য অংশের মানুষেরাও রয়েছেন। প্রাথমিক অনুমান বাদ পড়াদের মধ্যে গরিষ্ঠ অংশ হচ্ছে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা। তবে এটা স্পষ্ট যে সবচেয়ে বেশি বাদ পড়েছেন মহিলারা। সেই সংখ্যা ২৩ লক্ষ হতে পারে বলে পর্যবেক্ষকদের অনুমান। মহিলাদের পারিবারিক বিবাহ সংক্রান্ত নথির সমস্যা থাকায় এই ঘটনা ঘটেছে। পঞ্চায়েতের দেওয়া নথি সুপ্রিম কোর্ট বৈধ বলে ঘোষণা করলেও এন আর সি কর্তৃপক্ষ তার স্বীকৃতি দেয়নি বলেও প্রচুর মহিলা বাদ পড়েছেন।

বিজেপি ছাড়া বামপন্থী দলগুলি এবং কংগ্রেস সহ অধিকাংশ রাজনৈতিক দল এন আর সি প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করেছে। আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও এর বিরোধিতা করেছেন বটে তবে তার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন আছে। কারণ ২০০৫ সালে বিজেপির মতই তিনিও বলেছিলেন যে পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ভোটার তালিকায় এরা নাম তুলছে। ২০০৫-এ এই বিষয়ে তৎকালীন পশ্চিমবাংলার বিরোধী নেত্রী এবং সাংসদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে লোকসভায় বলতে না দেওয়ায় অধ্যক্ষের দিকে তিনি কাগজ ছুঁড়ে মেরেছিলেন। বর্তমানে তিনি রাজ্যের প্রধান হিসাবেও আসামের এন আর সি সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করেননি। এন আর সি কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন রাজ্যের মত পশ্চিমবঙ্গেও এক লক্ষ মানুষের লিগেসি মূল্যায়ন সংক্রান্ত নথি পাঠিয়েছিল তার মধ্যে রাজ্য মূল্যায়ন করতে পেরেছে মাত্র ৬.৫ শতাংশ। বাতিল হওয়া ৪০ লক্ষাধিক মানুষের কিছু অংশের হলেও দায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার অস্বীকার করতে পারে না।

৪০ লক্ষ মানুষ আজ বিনিদ্র রজনী কাটাচ্ছেন আসামে। অনিশ্চিত ভবিষ্যত তাদের সামনে। ৪০ লক্ষ সংখ্যাটি কম নয়। আমাদের দেশের ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ডের মতন রাজ্যের জনসংখ্যাও ৪০ লক্ষের নীচে। এই বিপুল সংখ্যক মানুষ যদি নাগরিক পঞ্জির চূড়ান্ত তালিকায় স্থান না পান তবে কোথায় যাবেন — এর কোনো সদুত্তর নেই।

আসামে জাতীয় নাগরিক পঞ্জির ঘোলাজলে মাছ ধরতে নেমেছে সাম্প্রদায়িক ও বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলি। ধর্ম, ভাষা ও জাতি নিয়ে বিভেদের যে উস্কানিমূলক চেষ্টা বিজেপি, আর এস এস করে চলেছে তা দেশের ঐক্য ও অখণ্ডতার পক্ষে বিপজ্জনক। কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত অবিলম্বে নাগরিক পঞ্জি তালিকায় বাদ যাওয়া প্রকৃত নাগরিকদের নাম অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে যাবতীয় সমস্যা দূর করা। নাগরিকত্বের বিষয়টি চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত আসমে বসবাসকারী সকল ব্যক্তির নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার যাতে সুনিশ্চিত থাকে সেই বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া।

আসামের ঘটনার প্রেক্ষিতে এ রাজ্যেও সাম্প্রদায়িক শক্তি নতুনভাবে সক্রিয় হয়েছে। এরাজ্যের মানুষের মনেও আশংকার কালো মেঘ উঁকি দিচ্ছে। এই রাজ্যের তথা দেশের একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে আমাদেরও এই পরিস্থিতিতে প্রয়োজনে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে হবে। □

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতি (WBMOA)-এর শতবর্ষ উদ্‌যাপন (১৯২০-২০২০) কমিটি গঠন ও আলোচনা সভা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতি (WBMOA) -এর শতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি গঠন এবং ''উগ্র মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে শ্রমিক-কর্মচারীর ঐক্য রক্ষার সংগ্রাম''-বিষয়ক আলোচনা সভা বিগত ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৮ কলকাতার কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট হলে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতেই সঙ্গীত পরিবেশন করে সমিতির কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক শাখা। আবৃত্তি পরিবেশন করেন রীতা চন্দ্র। সমগ্র সভাটি পরিচালনা করেন সমিতির সভাপতি দেবলা মুখার্জী ও সহ-সভাপতিত্রয় চিত্তরঞ্জন গুপ্ত, মণীন্দ্র মাইতি এবং আশীষ দে-কে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। সভায় প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখতে গিয়ে সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুখেন কুণ্ডু বলেন, এটা সমিতির পক্ষে অত্যন্ত গর্বের যে ভারতবর্ষের সরকারী কর্মচারী সমতিগুলির মধ্যে আমরা প্রথম শতবর্ষে পদার্পণ করতে চলেছি এবং একে কেন্দ্র করে এই প্রাক শতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি গঠন করতে আমরা সমবেত হয়েছি। ১৯২০ সালে শুরুতে সমিতির নাম ছিল বেঙ্গল পুলিশ অ্যাসোসিয়েশন/বেঙ্গল মিনিস্টিরিয়াল অ্যাসোসিয়েশন। ১৯২০ সালের ৪ঠা এপ্রিল সংগঠনের প্রথম সভা হয়েছিল অবিভক্ত বাংলার কুমিল্লায় সমস্ত জেলার প্রতিনিধিদের নিয়ে একমাত্র কোচবিহার জেলা ছাড়া। ১৯২০ সালের ডিসেম্বরে ২৫০ জন প্রতিনিধিকে নিয়ে প্রথম সম্মেলন হয় আলিপুরে, চেতলা বয়েজ হাইস্কুলে। পরবর্তীতে সমিতির নাম পরিবর্তন হয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতি (WBMOA) হয়েছে। সমিতির প্রথমে মুখপত্রের নাম ছিল ''The Back Bone''। ১৯৫৪ সালে প্রথম 'সমন্বয়' নামে প্রকাশিত হয়। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পরবর্তীতে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন সরকার সরকারী আদেশনামা **357-F** dated **23/02/1948**-এ সংগঠনের স্বীকৃতি দেয়। জন্মলগ্ন থেকেই সমিতি কর্মচারীদের অর্জিত অধিকার আদায় ও রক্ষার্থে লড়াই আন্দোলন করেছে, বর্তমানে করছে আগামীতেও এ লড়াই জারী থাকবে।

সংগঠনের শতবর্ষ উদযাপন কমিটির প্রস্তাবনা পেশ করেন সমিতির অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক অভীক সেনগুপ্ত। বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ সুবিমল সেন-কে সভাপতি, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিংহ সহ সমিতির সভাপতি, সহ-সভাপতিদের কে যুক্ত করে সহ সভাপতি, সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুখেন কুণ্ডুকে সম্পাদক, সমিতির কোষাধ্যক্ষ এবং দপ্তর সম্পদককে উদ্‌যাপন কমিটির কোষাধ্যক্ষ এবং দপ্তর সম্পাদক করে সমিতির বর্তমান ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য এবং রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্তর্ভুক্ত ৩২টি সমিতি এবং রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতির সাধারণ সম্পাদকদের যুক্ত করে একটি শক্তিশালী কমিটি এবং কয়েকটি উপসমিতিসহ কার্যকরী কমিটি ও উপদেষ্টামণ্ডলী নামের প্রস্তাব করেন। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধান অতিথি রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বলেন একটি সংগঠন শতবর্ষের অভিমুখে যাত্রা করছে। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে সমিতির লড়াই ছিল মূলত প্রশাসনের অভ্যন্তরে। স্বাধীনতা পরবর্তীতে সেই লড়াই ক্রমে মেহনতী মানুষের স্বার্থ রক্ষার লড়াইয়ে পরিণত হয়। ১৯৫৬ সালে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির গঠনের কাল থেকে যেসমস্ত সমিতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রতিপালন করেছে তারমধ্যে এই সমিতি একটি। দেশের কৃষক-শ্রমিক-মেহনতী মানুষ দারুণভাবে আক্রান্ত। এর বিরুদ্ধে বিগত ৫ সেপ্টেম্বর 'মার্চ টু পার্লামেন্ট' কর্মসূচী দারুণ সাফল্যলাভ করেছে। রাজধানীর রাজপথ সেদিন লাল ঝাণ্ডা হাতে মেহনতী মানুষের দখলে চলে যায়, রাজ্যের ক্ষেত্রেও গণতন্ত্রের ওপর বীভৎস আক্রমণ চলছে। বিগত ৮ বছরে বর্তমান সরকারের সময়কালে রাজ্যের শ্রমজীবী মানুষের সাথে শ্রমিক-কর্মচারীরাও দারুণভাবে আক্রান্ত। এর বিরুদ্ধে ধারাবাহিক লড়াই আন্দোলন জারী রয়েছে। আপনাদের শতবর্ষ উদ্‌যাপনের লক্ষ্য হোক দেশ ও রাজ্যকে রক্ষা করা, গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধার করা। ওরা গণতন্ত্রকে হত্যার চেষ্টা করছে, কিন্তু শ্রমিক কর্মচারীরাই শেষ কথা বলবে।

পরবর্তীতে শতবর্ষের লোগোর উদ্বোধন করেন শতবর্ষের উদ্‌যাপন কমিটির সভাপতি বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ সুবিমল সেন। ''উগ্র মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা বিরুদ্ধে শ্রমিক কর্মচারীর ঐক্য রক্ষার সংগ্রাম''— বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ডঃ সুবিমল সেন আলোচনার প্রারম্ভে বলেন যে বিষয়ে আলোচনা সেটাই এ মুহূর্তের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ, যা হওয়ার কথা ছিল না। উগ্র মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাকে সমানে আনার মধ্য দিয়ে দেশের আসল সমস্যাগুলি পেছনে চলে যাচ্ছে। ফসলের লাভজনক দাম না পেয়ে কৃষক আত্মহত্যা করছে, কিন্তু ফসলের দাম বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সরকার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করছে না। দেশে কর্মসংস্থান কমছে, শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা চাকুরীর সুযোগ পাচ্ছে না, দেশে বেকার বাড়ছে। অপরদিকে কাজ পেলেও না থাকছে নুন্যতম মজুরীর নিশ্চয়তা, না আছে কাজের কোনো নির্দিষ্ট সময় সারণী। এক কথায় বেকার যুবক যুবতীরা চাকরী পেলেও তা টিকিয়ে রাখার চেষ্টা তাদের করতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত। শিল্প কলকারখানা যেটুকু আছে সেখানেও শ্রমিক ছাঁটাই চলছে। আজ দেশের শাসকদল চাইছে মানুষের একমাত্র পরিচয় হোক তার ধর্ম, কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে মহারাষ্ট্রের যে কৃষকরা লঙ মার্চ করেছেন, তাদের সামনে ধর্ম কোনও বাধা হয়নি, আবার আত্মঘাতী কৃষকদেরও কোনো ধর্ম বিভাজন হয় না। আমরা বিশ্বাস করি আমাদের পরিচয় ধর্ম নয় কর্ম হওয়া উচিত। আমাদের মনে রাখতে হবে প্রতিটি ধর্মেই কিছু মানবিক দিক আছে যাকে মৌলবাদীরা মানতে চায় না। এদেশে হিন্দু মৌলবাদীরা মুসলিম ধর্ম এবং ধর্মবালম্বী মানুষের সম্পর্কে মনগড়া তথ্য পরিবেশন করে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করা হোল। আমাদের মধ্যেও যে এরকম মানসিকতা নেই একথা বলা যাবে না। আমাদের একটা বড় অংশের ধারণা যে মুসলীম আর অপরাধ পাশাপাশি অবস্থান করে। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না স্বাধীনতার পর থেকে দেশে যেকটি বড় আর্থিক কেলেঙ্কারী হয়েছে তার পেছনে যারা রয়েছে হর্ষদ মেহতা থেকে আজকের বিজয় মালিয়া, ললিত মোদী, নীরব মোদী, মেহুল চোকসী কেউই কিন্তু মুসলীম নন। অর্থাৎ অপরাধীর কোনো ধর্ম হয় না তার একটাই পরিচয় সে অপরাধী। আর এটা অনেকটা নির্ভর করে আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির ওপর। এটাও দেখা গেছে যে উগ্র মৌলবাদ অন্য ধর্মের যে ক্ষতি করে তার থেকে অনেক বেশী ক্ষতি করে নিজ ধর্মের মানুষের। সাম্প্রদায়িকতার একটা সুপ্ত বীজ স্বাধীনতা পূর্ববর্তী একটা দীর্ঘ সময় থেকেই আমাদের মধ্যে নিহীত ছিল। পাশাপাশি বসবাস করলেও মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষদের হিন্দুদের বাড়িতে প্রবেশাধিকার ছিল না। ইংরেজ শাসকরা এগুলিকে নজরে রেখেই Divide And Rule কে প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তীতে যে সমস্ত জায়গায় উদ্বাস্তু কলোনী তৈরী হয়েছিল, সেখানে সেসময়ে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করা যায় নি কারণ সেসময় বামপন্থী মানুষেরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। মানুষকে প্রশ্ন করা বা জানার অধিকার হলো একটি চর্চা, একটি ঐতিহ্য তাতে বাধা হচ্ছে এখন। আমাদের এ সময়ে একটু বাড়তি দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে, হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরকে আরো একটু ভালোভাবে জানতে ও চিনতে হবে। তাহলে আর এস এস নামক মৌলবাদীদের কোনও কূটনীতি কাজ করবে না। আজকে আমাদের আসল পরিচিতি থেকে যখন নজর ঘুরিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা চলছে তখন নিজের প্রকৃত পরিচয় ভুলে গেলে চলবে না। এখানেই শ্রমিক কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধভাবে এক বড় দায়িত্ব নিতে হবে। এই বিদ্বেষ ও বিভেদের শক্তিকে প্রতিহত করতে ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। নিজেদের সতর্ক হতে হবে, মানুষকে সতর্ক করতে হবে। যতক্ষণ আমরা নিজেদের এই বিভাজন থেকে মুক্ত করতে না পারব ততক্ষণ পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে পারবো না। শুধু DA বাড়ানোর আন্দোলন নয়, ঐক্যবদ্ধভাবেই মানুষের অধিকার রক্ষার প্রশ্নে, সুস্থ সমাজ তৈরী করার প্রশ্নে আমাদের পরিবার পরিজনসহ সঠিক ভূমিকা প্রতিপালন করতে হবে। □

দেবাশীষ রায়

রক্তদান কর্মসূচী

১৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি **হুগলী জেলা শাখার** আহ্বানে চুঁচুড়াস্থিত জেলা সমিতি ভবনের প্রাণেশ গোস্বামী সভা কক্ষে মহতী স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়।

সভার সূচনায় উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক শম্ভুনাথ সেনগুপ্ত। রক্তদাতাদের উৎসাহিত করতে কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে অন্যতম সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড চুনীলাল মুখার্জী এবং চুঁচুড়া সদর হাসপাতাল ব্লাড ব্যাঙ্কের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসকর মাননীয় স্বপন দলুই বক্তব্য রাখেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রক্তদাতাদের সাথে কর্মচারীদের পরিবার-পরিজনসহ শতাধিক উপস্থিত ছিলেন। এই কর্মসূচীতে ৫জন মহিলাসহ মোট ৪০ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

সমগ্র অনুষ্ঠানে সভাপতিমণ্ডলীর দায়িত্ব করেন যথাক্রমে বলরাম বর্মন, শুভজিৎ মন্ডল এই অনুষ্ঠানে জেলা ১২ই জুলাই কমিটির যুগ্মআহ্বায়ক সুধাংশু কুণ্ডু উপস্থিত ছিলেন।□

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি, **উত্তর ২৪ পরগনা জেলা শাখার** উদ্যোগে আজ অর্থাৎ ১৩-০৯-২০১৯ প্রায় শতাধিক কর্মচারী ও তাঁর পরিবার পরিজনের উপস্থিতিতে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচী সাফল্যের সাথেই অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত কর্মসূচী পরিচালনা করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অন্যতম সহ-সভাপতি দূর্গা রায়। এই কর্মসূচীর উদ্বোধক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি, কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সহ-সভাপতি সুনির্মল রায়। এছাড়া এই সভায় বক্তব্য উত্থাপন করেন রক্তদান উপসমিতির আহ্বায়ক কৃতজিৎ চ্যাটার্জী এবং রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সম্পাদক পার্থ গোস্বামী। এই রক্তদান কর্মসূচীতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতির পরিবার পরিজন ও অংশগ্রহণ করেছেন। ১১ জন মহিলাসহ মোট ৮০ জন রক্তদাতা রক্তদান করেন। □

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি **পুরুলিয়া জেলা শাখার** উদ্যোগে গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮ রক্তদান কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন করেন জেলার ১২ই জুলাই কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক তপন রায় চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন ডাঃ মনোরঞ্জন মণ্ডল। ৫ জন মহিলা সহ মোট ২০ জন রক্তদান করেন। □

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি, **হাওড়া জেলা শাখার** উদ্যোগে আইএমএ হলে গত ২রা সেপ্টেম্বর স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মসূচী উদ্বোধন করেন সংগ্রামী হাতিয়ার পত্রিকার সম্পাদক সুমিত ভট্টাচার্য। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক অসিত দাস। সভাপতিত্ব করেন জেলা সভাপতি দিলীপ ব্যানার্জী। মোট ৩৭ জন রক্তদাতা রক্তদান করেন। □

মহিলা জেলা কনভেনশন

২৬ সেপ্টেম্বর	উত্তর ২৪ পরগনা	উপস্থিত ৫১ জন
১৮ সেপ্টেম্বর	আলিপুরদুয়ার	উপস্থিত ৪৭ জন
১৮ সেপ্টেম্বর	উত্তর দিনাজপুর	বক্তা: মাধবী দেবনাথ
১৮ সেপ্টেম্বর	দার্জিলিং	বক্তা : কল্পনা ভৌমিক
১৮ সেপ্টেম্বর	পুরুলিয়া	বক্তা : মীরা সেনাপতি অনিমা দেওঘরিয়া পিয়ালী সাহা। সভাপতি : সুপ্তি সহিস
১৮ সেপ্টেম্বর	মালদা	বক্তা : মলি দাস

পশ্চিমবঙ্গ ডাইরেক্টরেট এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন

সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের সমাপ্তি অনুষ্ঠান

গত ২রা সেপ্টেম্বর'২০১৮, রবিবার বেলা ১২টায় যোগেশ মাইম একাডেমী হলে পশ্চিমবঙ্গ ডাইরেক্টরেট এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশনের মুখপত্র শরিক-এর সুবর্ণজয়ন্তীবর্ষ সমাপ্তি অনুষ্ঠান সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছুটির দিন, দুপুরবেলা প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মুষলধারার বৃষ্টি উপেক্ষা করেই প্রায় তিনশ'জন এই কর্মসূচীতে উপস্থিত হয়েছিলেন। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম-সম্পাদক, সভাপতি এবং সম্পাদকমণ্ডলীর একজন সদস্য সহ সমিতি ও ভাতৃপ্রতিম সংগঠনগুলির প্রাক্তন ও বর্তমানের নেতৃত্ব ও কর্মীরাও উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে চিরায়ত ঐতিহ্যের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পারিবারিক মিলনোৎসবের এই কর্মসূচী উপস্থিত সকলের কাছে খুবই হৃদয়গ্রাহী ও আকর্ষণীয় হয়েছে। সঙ্গীত পরিবেশন করেন সমিতির সাংস্কৃতিক শাখা। শুরুতে ২২ জন পুরুষ ও মহিলা সঙ্গীত শিল্পী সুর ও ছন্দের লাবণ্যে অনুষ্ঠানের অনবদ্য সূচনা করেন। প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের স্বনামধন্য বাচিক শিল্পী আনোয়ারা সুলতানা স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য ও কবিতাপাঠ খুবই মর্মস্পর্শী হয়েছে। সংক্ষিপ্ত কথায় সমিতির সাধারণ সম্পাদক, শরিকের চেয়ারম্যান ও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক চলমান সংগ্রামের মূর্তপ্রতীক শরিকের ঐতিহাসিক ভূমিকা ও গুরুত্বের কথা বর্ণনা করেন। যাঁর হাত ধরে শরিক পথ চলা শুরু করে ৫০ বছর অতিক্রম করেছে সেই প্রয়াত কমরেড সুকোমল সেনের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে বক্তাদের কথায় উচ্চারিত হয়েছে।

শরিক সুবর্ণজয়ন্তীবর্ষ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার প্রথম স্থানাধিকারীরা অনুষ্ঠান মঞ্চে তাঁদের আবৃত্তি, সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন করেন। আমন্ত্রিত 'নবগীতিকা' সঙ্গীত সংস্থার মহিলা সঙ্গীত শিল্পীবৃন্দ সঙ্গীত পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল সমিতির সদস্য/সদস্যাদের দ্বারা অভিনীত নাটক 'কবীর'। সময়োপযোগী একটি অসাধারণ প্রযোজনা দর্শকদের মুগ্ধ করেছে। এরপর ২০১৮ সালের মাধ্যমিক/উচ্চ-মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৩৪ জন ছাত্রছাত্রীকে সমিতির পক্ষ থেকে সংবর্ধিত করা হয়। এবং সব শেষে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া ৪ জন মেধাবী ছাত্রছাত্রীকে দশ হাজার টাকা করে প্রত্যেককে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। সামাজিক দায়বদ্ধতার এই কর্মসূচী প্রতিবছর পালন করার অঙ্গীকার সমিতি ইতিমধ্যে গ্রহণ করেছে। সকল সদস্য, অতিথি, প্রতিযোগী, ছাত্রছাত্রী ও শুভানুধ্যায়ীর হাতে শরিক সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ স্মারক অর্পণ করা হয়। □

আলোচনা সভা

২২ সেপ্টেম্বর **বর্ধমান**	বিষয়: ক) স্বাধীনতা উত্তরকালে কর্মচারী আন্দোলনের গতি প্রকৃতি। (খ) সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের বিরুদ্ধে শ্রমিক কর্মচারীদের ঐক্য রক্ষার সংগ্রাম।
২৩ সেপ্টেম্বর **বাঁকুড়া**	বিষয় : ক) স্বাধীনতা উত্তরকালে কর্মচারী আন্দোলনের গতি প্রকৃতি। বক্তা : কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য আশীষ ভট্টাচার্য। (খ) সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের বিরুদ্ধেশ্রমিক কর্মচারীদের ঐক্য রক্ষার সংগ্রাম। বক্তা : কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী।
২০ সেপ্টেম্বর **দার্জিলিং**	(খ) সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের বিরুদ্ধে শ্রমিক কর্মচারীদের ঐক্য রক্ষার সংগ্রাম। বক্তা : জেলা যুগ্ম সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরকার।
২০ সেপ্টেম্বর **হাওড়া**	(খ) সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের বিরুদ্ধে শ্রমিক কর্মচারীদের ঐক্য রক্ষার সংগ্রাম। বক্তা : জেলা সভপতি : দিলীপ ব্যানার্জী।

আলিপুরদুয়ার

দার্জিলিং

Editor : SUMIT BHATTACHARYA
SANGRAMI HATIAR

State Co-ordination Committee
47th Year, 4th Issue, August '18

Regd. No. : 18484/71
Price : Two Rupees

রাজ্য মহিলা কনভেনশনে আলোচনারত প্রতিনিধিবৃন্দ

মহিলা কনভেনশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাজ্যের মুখ্য সচিবকে চিঠি দিল রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি

স্মারক সংখ্যা ঃ কো-অডিনেশন — তারিখ- ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৮

মাননীয়,
মুখ্যসচিব
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিষয় ঃ **রাজ্য প্রশাসনে কর্মরত মহিলা কর্মচারীদের কিছু জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান প্রসঙ্গে**

মহাশয়,

আপনি নিশ্চয়ই জানেন রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের একটি বিপুল অংশের অধিকারিনী হলেন মহিলা কর্মচারীরা। তাঁরা রাজ্য প্রশাসনের প্রায় সমস্ত বিভাগের সাথে যুক্ত। অন্তঃবিভাগের পাশাপাশি একটি বিপুল অংশের মহিলা কর্মচারীরা বহিঃবিভাগে ও গ্রামীণ এলাকায় বিস্তীর্ণ পরিসর জুড়ে পরিব্যাপ্ত রয়েছেন। আপনি নিশ্চিত একমত হবেন সরকারের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডে অন্যান্যদের সঙ্গে মহিলা কর্মচারীদের ভূমিকা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। সমাজের অন্যান্য অংশের মহিলাদের মতই এই রাজ্যে তাঁরা বহুবিধ গুরুতর সামাজিক সমস্যার শিকার। কিন্তু, প্রশাসনে কর্মরত মহিলাদের বিশেষ কিছু সমস্যা সম্পর্কে আমরা সংগঠনের পক্ষ থেকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই এবং নিম্নলিখিত সমস্যাবলীর দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য আপনার হস্তক্ষেপ দাবী করছি।

প্রথমত, ২০১৩ সালে কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি বন্ধে আইন প্রনীত হয়েছে তা রূপায়নে সমস্ত বিভাগ, অধিকার, আঞ্চলিক অফিসগুলিতে অভ্যন্তরীণ অভিযোগ সমিতি (ইন্টারন্যাল কমপ্লেইন কমিটি) গঠিত হয়নি, যেখানে গঠিত হয়েছে সেখানে এই আইন মোতাবেক আনীত অভিযোগগুলির নিষ্পত্তির জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হচ্ছে না। তাই আমরা যে সকল বিভাগ/অধিকার/আঞ্চলিক দপ্তরগুলিতে মহিলা কর্মচারী/আধিকারিকরা আছেন সেখানে দ্রুত এই কমিটি গঠন ও তার কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

দ্বিতীয়ত, বিভাগ/অধিকার/আঞ্চলিক অফিস কেন্দ্রগুলিতে মহিলা কর্মচারীদের জন্য উপযুক্ত বিশ্রামকক্ষ নেই, সন্তানবতী মহিলাদের শিশুদের জন্য ক্রেশের ব্যবস্থা নেই, আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাবলী সম্বলিত কাঠামো তো দূরের কথা; সবচেয়ে বেদনার হল কর্মস্থানে মহিলাদের পৃথক ও স্বাস্থ্যকর প্রক্ষালায় পর্যন্ত নেই। সরকার অফিসগুলির সংস্কার, পুর্নগঠন নতুন নির্মাণের বিষয়ে যতটা সচেষ্ট মহিলাদের উল্লিখিত জরুরী ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাবলীর জন্য তত উদগ্রীব নয় বলেই আমাদের মনে হয়েছে।

তৃতীয়ত, বেশকিছু জায়গা থেকে এমন রিপোর্টও আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে যেখানে নির্ধারিত সময়ের পর বিশেষত সন্ধ্যের পর মহিলাদের কর্মক্ষেত্রে আটকে রাখা হচ্ছে, এর ফলে তাঁরা অপরিসীম কষ্ট ও মানসিক উদ্বেগের সম্মুখীন হচ্ছেন।

উল্লিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে আমরা আপনার সঙ্গে সাক্ষাতে বিশদে আলোচনা করতে আগ্রহী।

এছাড়াও, গত ৮-৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখে আমাদের সংগঠনের উদ্যোগে সারা রাজ্য থেকে আসা মহিলা প্রতিনিধিদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য কনভেনশনে গৃহীত জরুরী দাবিগুলিকেও আপনার সবিশেষ বিবেচনা ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পত্রের সাথে যুক্ত করা হল।

পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে আমরা এ ব্যাপারে আপনার দ্রুত ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য দাবি জানাচ্ছি।

একই সঙ্গে আশা করছি, আপনার সবিশেষ ব্যস্ততার মধ্যে আমাদের সঙ্গে উল্লিখিত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনার জন্য সময় দেবেন।

ধন্যবাদান্তে,

ভবদীয়
বিজয়শংকর সিংহ
(বিজয়শংকর সিংহ)
সাধারণ সম্পাদক

এই চিঠির অনুলিপি সমস্ত বিভাগীয় সচিব এবং জেলা শাসকদের নিকট পাঠানো হয়েছে।

সঙ্গীত পরিবেশন করছে সংগঠনের কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক টিম।

সম্পাদক ঃ সুমিত ভট্টাচার্য
সহযোগী সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
যোগাযোগ ঃ দূরভাষ-২২৬৪-৯৫৯৩, ২২৬৫-০৯২৬ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২১৭-৫৫৮৮
ই-মেল ঃ sangramihatiar@gmail.com
ওয়েবসাইট ঃ www.statecoord.org
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কোঃ অপঃ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিঃ ১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত।